—মুত্তাকীর পরিচয় হলো—সচ্ছল এবং অনটন সর্বাবস্থায় যারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, রাগ-রোষ হজম করে এবং মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে। বস্তুত আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।

এতে সৎপথে ব্যয় করা, রাগ দমন করা, ক্ষমা ও ইহসান তথা সৎকর্মের বর্ণনা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ٠

—তোমাদের মুখমণ্ডল পূর্ব-পশ্চিমমুখী করা সৎকর্ম নয়, বরং সৎকর্ম হলো—আল্লাহ্, কিয়ামতের দিন, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীগণের প্রতি কারো বিশ্বাস স্থাপন করা এবং আল্লাহ্‌র মহব্বতে নিকটাত্মীয়, পিতৃহীন ইয়াতীম, গরীব-মিসকীন, অভাবী মুসাফির, ভিক্ষুক এবং গোলাম আযাদের ব্যাপারে সম্পদ ব্যয় করার মধ্যে। আর যারা নামায কায়েম করে, রোযা পালন করে, তাদের কৃত অঙ্গীকার যথাযথভাবে পূরণের চেষ্টা করে, অভাব-অনটন এবং বিপদ-মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করে, তারাই মূলত সত্যবাদী এবং তারাই প্রকৃত খোদাভীরু ও মুত্তাকী।

তাকওয়ার যাবতীয় বিভাগ সংক্ষিপ্তাকারে অত্র আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তাতে অর্থহীন আকার-আকৃতি যথেষ্ট মনে করাকে নিষেধ করা হয়েছে। لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ ..... الى اخره আয়াতাংশ এ কথারই প্রমাণ। মুনাফিক ও ইহুদীরা কেবলা পরিবর্তন বিষয়ে যেমন চর্চায় মেতে উঠেছিল। অতঃপর আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস, আখিরাতে বিশ্বাস, ফেরেশতা, আসমানী গ্রন্থসমূহ এবং নবীদের প্রতি বিশ্বাসের নির্দেশ উল্লেখ করা হয়েছে। এসব ছিল বিশ্বাস-ই'তিকাদ সম্পর্কিত নির্দেশমূলক আলোচনা। অতঃপর আত্মশুদ্ধি, মনের কপটতা দূর করা কিংবা আল্লাহ্‌র মহব্বতে উৎসাহব্যঞ্জক অর্থ ব্যয়ের নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে। এরপর ব্যক্ত হয়েছে নামায কায়েমের হুকুম যা দীনের প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন। পরে অর্থনৈতিক আনুগত্য প্রদর্শনের চিহ্নস্বরূপ যাকাতের উল্লেখ রয়েছে। অবশ্য প্রথমাংশেও অর্থ ব্যয়ের উল্লেখ রয়েছে

কিন্তু সেটা ঐচ্ছিক ভিত্তিতে। যাকাতের মধ্যে মাল খরচ করার উল্লেখ হয়েছে বাধ্যতামূলক হিসাবে। নফল হিসাবে মাল খরচের উল্লেখ হাদীসেও লক্ষ করা যায়। যেমন তিরমিযীর হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে ঃ ان فى المال لحق سوى الزكوة ثم تلا الاية . অর্থাৎ যাকাত ছাড়াও মালের মধ্যে হক রয়েছে। অধিকন্তু আয়াতে বর্ণিত على حبه (তাঁর মহব্বতে) বাক্যেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ এর মারজা (প্রত্যাবর্তনস্থল) যদি মাল হয়, তবে অর্থের মোহ দূর করার জন্য শুধু যাকাত যথেষ্ট নয়, অতিরিক্ত কিছু দানের প্রয়োজন স্বীকৃত। আর এর মারজা' যদি হয় 'আল্লাহ্', তবে আল্লাহ্‌র মহব্বতের দাবি এটাই যে, ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ ফরযের অতিরিক্ত কিছু মাল খরচ করা হোক। অতঃপর সামাজিক আচরণ হিসেবে অঙ্গীকার পূরণের নির্দেশ এবং শেষ পর্যায়ে সুলূক তথা আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানের লক্ষ্যে সবর ও ধৈর্যের নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে। মোট কথা—সংক্ষিপ্ত আকারে তাকওয়ার সকল দিক এতে বর্ণনা করা হয়েছে। কাজেই اولئك هم المتقون বাক্য দ্বারা আয়াত সমাপ্ত করা হয়েছে। অতএব এখন বলুন, কুরআনের ভাষায় আল্লাহ্ উপায় নির্দেশ করেছেন কি-না এবং তা মানুষের ইচ্ছাধীন কি-না ? তাহলে বিবেচনা করুন, জান্নাতে প্রবেশ করা ইচ্ছাধীন হলো কি-না ? এখন প্রশ্ন থাকে—আল্লাহ্ উপায় নির্দেশ করেছেন ঠিকই কিন্তু তা গ্রহণ ও যথাযথ প্রয়োগ তো তার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল তাছাড়া কিছুই হওয়া সম্ভব নয়। উত্তরে বলব—কথা ঠিকই, আমাদের বিশ্বাসও তাই। কিন্তু একথা বেহেশত-দোযখের বেলায়ই বা খাস হবে কেন, দুনিয়ার যাবতীয় কাজকর্মই তো তাঁর ইচ্ছাশক্তির অধীন। চাষাবাদ, দোকান-চাকরি সবই তো এ নীতির আওতাধীন। তাহলে সেসবের জন্য এত চেষ্টা তদবীর কেন ? এ ক্ষেত্রে তো বরং বলা হয় ঃ

رزق هر چند بيگماں برسد

ليك شرط است جستن از درها

—যে কোন অবস্থায় নিঃসন্দেহে রিয্‌ক পৌঁছবেই কিন্তু শর্ত হলো–সঠিক উপায়ে তার সন্ধান করতে হবে।

উপরন্তু মরণও আল্লাহ্‌র ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাপ-বিচ্ছুর দংশন থেকে আত্মরক্ষার কি অর্থ ? এ সম্পর্কে বরং বলতে শোনা যায় ঃ

اگرچه کس بے اجل نه خواهد مرد

تو مرو در دهاں اژدها

—নির্ধারিত সময় ছাড়া কারো মৃত্যু হবে না এটা চিরন্তন সত্য কিন্তু তবু তুমি অজগরের মুখে পড়ে আত্মাহুতি দিও না।

সমস্ত আস্থা-ভরসা কেবল আখিরাতের বিষয়ে জড়ো করা হয় এটা কেমন কথা। তাওয়াক্কুলের বড় বড় বুলি আওড়াতে হলে দুনিয়ার ব্যাপারেও করা উচিত ছিল। তাওয়াক্কুল করা আমার নিষেধ নয়, আমি কেবল আপনাদের ভুলটুকু ধরিয়ে দিচ্ছি যে, আপনারা যাকে তাওয়াক্কুল সাব্যস্ত করে নিয়েছেন আসলে সেটা তাওয়াক্কুল নয়। যে কোন প্রকার উপায় অবলম্বন বর্জন করাকে তাওয়াক্কুল বলা যায় না। এক্ষেত্রে বরং তাকদীর ও তাদবীরের (ভাগ্য ও উপায় অবলম্বন) একত্র সমাবেশ ঘটানোই সঠিক পন্থা। অন্য কথায় কাজটা সমাধা করার পরই তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা উচিত। কবি বলেছেন ঃ

گر توکل می کنی دو کار کن

کسب کن پس تکیه بر جبار کن

—"যদি তোমার তাওয়াক্কুলের আগ্রহ থাকে, তবে দুটি কাজ করতে হবে। প্রথম—কাজ কর, অতঃপর আল্লাহ্র উপর ভরসা কর।" পার্থিব ব্যাপারেও আমরা বলে থাকি "বীজ বুনে ফলের আশায় আল্লাহ্র প্রতি ভরসা রাখ।" সার কথা হলো—কাজের ক্ষেত্রে উপায় অবলম্বন কর আর ফলের জন্য তাওয়াক্কুল কর। তাই লক্ষ করা যায়—পার্থিব ব্যাপারে সবাই অভিন্ন নীতির পক্ষপাতী, কিন্তু আখিরাতের ব্যাপারে বিভক্ত বড় বিস্ময়কর যে, পরকালীন ব্যাপারে তারা কর্ম ও ফল উভয় ক্ষেত্রে কেবল ভরসা নীতিতে বিশ্বাসী। অথচ এক্ষেত্রেও পার্থিব ব্যাপারের ন্যায় একই পন্থা গ্রহণ করা উচিত ছিল। নতুবা উভয়টির পার্থক্য নির্ণয় করা উচিত। বস্তুত গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ করলে প্রতীয়মান হয় যে, দুনিয়া ও আখিরাতের পার্থক্যের দাবি বরং এই যে, উপায়-উপকরণ বর্জনের অবকাশ প্রথমটির ব্যাপারে কল্পনা করা যেতে পারে বটে কিন্তু দ্বিতীয়টির ব্যাপারে মোটেই না। কেননা উপায় ত্যাগ করাই হলো তাওয়াক্কুলের মূল কথা। প্রণিধানযোগ্য যে, যে উপায়ের বাস্তব ফলশ্রুতি সাধারণত নিশ্চিত নয় আর শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিবও নয় এমন সব উপায় বর্জন করা যেতে পারে। কিন্তু যেসব উপায়ের ফলের বাস্তবায়ন নিশ্চিত সে উপায় বর্জন করা জায়েয নয়। অধিকন্তু ক্ষুধার দাবি না মিটিয়ে নীরব বসে থাকার নাম তাওয়াক্কুল নয়। এমতাবস্থায় মারা গেলে সে গুনাহগার হবে। অবশ্য যে উপায়ের বাস্তব ফল নিশ্চিত নয় এমন উপায় বর্জন করা সে ব্যক্তির জন্য জায়েয যে নিজে দৃঢ় মনোবলের এবং তার পরিবার-পরিজনও শক্ত মনের অধিকারী অথবা যদি তার পরিবারই না থাকে। কিন্তু

পরিবার কিংবা নিজে দুর্বলচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে এ-ও জায়েয নয়। তদ্রূপ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দেশিত বিষয় বর্জন করার নাম তাওয়াক্কুল নয়। তাওয়াক্কুল সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর চিন্তা করুন, শরীয়ত কর্তৃক নির্দেশিত আখিরাতের উপায়সমূহের ধরন কিরূপ ? সেগুলো মামূরবিহী (নির্দেশিত) কি-না ? অবশ্যই এসব শরীয়তের নির্দেশিত বিষয়। তদুপরি এটাও লক্ষ করতে হবে যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে তার বাস্তব ফল নিশ্চিত—না-কি সন্দেহযুক্ত। কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে প্রমাণিত যে, আখিরাতের উপায়ের বাস্তব প্রতিফলন অনিবার্য। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ۔

—যে সব ঈমানদার সৎকাজ করবে, তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র অন্যায় করা হবে না। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۔

—প্রত্যেকের বিন্দুমাত্র সৎকাজ তিনি লক্ষ্য রাখছেন, অনুরূপ ব্যক্তির বিন্দুসম অসৎকাজও তাঁর দৃষ্টির আয়ত্তাধীন।

এ ধরনের বহু আয়াতে আখিরাত বিষয়ক আমলের নিশ্চিত প্রতিদানের ওয়াদা ব্যক্ত রয়েছে। অথচ দুনিয়াবী আমল সম্পর্কে এ জাতীয় ওয়াদা-অঙ্গীকার নির্দিষ্ট নেই, অধিকাংশ উপায়ের বাস্তব ফল প্রকাশ জরুরী নয়। যদিও প্রত্যেক বস্তুর একটা না একটা উপায় আছেই। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ ما جعل الله داء الا جعل له دواء—অর্থাৎ আল্লাহ্ এমন কোন ব্যাধি সৃষ্টি করেননি যার প্রতিষেধক বা ঔষধ দেননি। এজন্যই চেষ্টার মাধ্যমে উপায়ের আশ্রয় নেয়া শরীয়তের বিধান। কিন্তু "তা ফলবতী হবেই" আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এমন কোন ওয়াদা নেই। কাজেই উপায় সময়ে অকার্যকর হয়ে পড়ে যে, বীজ বোনা সত্ত্বেও ফসল হয় না, ঔষধ প্রয়োগ করা হলেও নিরাময় হতে দেখা যায় না। আর ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ পাওয়া অনিবার্য নয়। অথবা কোন শর্তও নেই যে, ঔষধ ব্যতীত রোগ আরোগ্য সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে আখিরাতের আমলের সাথে শর্ত ও কারণ উভয়টি জড়িত। যদিও এ দুটি যুক্তিভিত্তিক বিষয় নয় বরং শরীয়ত নির্ধারিত। ফল প্রকাশে অনিবার্যতার ক্ষেত্রে আখিরাতের আমলের অবস্থা নিশ্চিত সুফলবিশিষ্ট পার্থিব উপায়ের ন্যায়, যার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাওয়া অনিবার্য। যথা—আহারের ফল তৃপ্তি এবং পানের সুফল নিবৃত্তি বাস্তবে প্রকাশ পাবেই। বরং আল্লাহ্র ওয়াদা করা বা না করার ব্যবধান সাপেক্ষে পরকালীন আমলের কারণ এসব

পার্থিব ফল অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রসূ। সুতরাং ইহজীবনে এসব উপায়-উপকরণ বর্জন করা যেরূপ জায়েয, আখিরাতের যাবতীয় হুকুম সম্পর্কেও তদ্রূপ একই বিধান যে, এসবের একটিও ছেড়ে দেয়া জায়েয নয়। কেননা এসব উপায় অবলম্বনের সফলতা সম্পর্কে শরীয়তে নিশ্চিত ওয়াদা করা হয়েছে। অতএব আশ্চর্যের ব্যাপার হলো—যেসব জিনিসের প্রতিদানের কোন ওয়াদা নেই সে সবের জন্য ন্যূনতম তদবীরের আশ্রয় নিতেও ত্রুটি করা হয় না। অথচ প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং বিন্দুমাত্র খেলাফের অবকাশ নেই সেখানে তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে বসে থাকা হয়। ইহ ও পরজগতের পারস্পরিক ব্যবধানের দৃষ্টিতে এর প্রতিক্রিয়ায় দুনিয়ার কোন কোন উপায় থেকে তাওয়াক্কুল করা বৈধ আর আখিরাতের যে কোন উপায়ে তাওয়াক্কুল অবৈধ ঘোষিত হওয়া উচিত ছিল। এটা হলো উপায় বা মাধ্যম সম্পর্কিত আলোচনা। কিন্তু 'মুসাববাব' তথা ফলাফল সম্পর্কে বিধান হলো—তা পার্থিব হোক বা পারলৌকিক, সর্বক্ষেত্রে ভরসা রাখতে হবে একমাত্র আল্লাহ্‌র ওপর। অর্থাৎ ফলাফলকে উপায়ের ক্রিয়া ধারণা করার পরিবর্তে একমাত্র আল্লাহ্‌র দান মনে করতে হবে। উত্তমরূপে বিষয়টা বুঝে নিন। —দাওয়াউল গাফ্‌ফার, পৃষ্ঠা ১০

৫৪. চাঁদ দেখা নিয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে শবেবরাত কোন্ তারিখে হবে এবং কোন্ তারিখের রোযা উত্তম হবে ?

যত ইচ্ছা তোমরা চর্চা করতে পার যে, পনর তারিখের সওয়াব নির্দিষ্ট একটি দিনের সাথে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু মহান আল্লাহ্ নির্দিষ্ট কোন স্থান বা কালে বিশেষ ফযীলত সৃষ্টি করে এরূপ গণ্ডিভুক্ত হয়ে পড়েন না যে, অন্য কোন স্থান বা কালে এর পুনরাবৃত্তিতে তিনি অপারক। বরং প্রতি দিন, প্রতি রাত তিনি এ জাতীয় ফযীলত সৃষ্টি করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান। এখন প্রশ্ন আসতে পারে—কোন কিছুর সম্ভাবনা থাকলেই তার বাস্তবায়ন অনিবার্য নয়। এর জবাব হলো—অন্যান্য দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত যে, আল্লাহ্‌র বিধান হলো—নির্দিষ্ট তারিখে যে ফযীলত তোমাদের জন্য নির্ধারিত, সে একই ফযীলত অন্যদের জন্য ভিন্ন তারিখেও সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব, নিজেদের সন্ধানের ভিত্তিতে যে দিনটিকে তারা পনর তারিখ হিসেবে সাব্যস্ত করে নেয়। এক রাত থেকে অপর রাতে বরকত স্থানান্তরিত করাটা তাঁর পক্ষে এমন কি কঠিন কাজ। বস্তুত তাঁর ক্ষমতার অবস্থা হলো ঃ اولئك يبدل الله سيأتهم حسنات অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের পাপাচার পুণ্যে, তাদের অপরাধ আনুগত্যে রূপান্তরিত করে থাকেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ হাশর প্রান্তরে আল্লাহ্ জনৈক বান্দার প্রতি প্রথমে ছোট ছোট গুনাহ্‌র উল্লেখ করে প্রশ্ন করবেন ঃ তুমি কি অমুক কাজটি করনি, এরূপ কাজ কি তুমি করনি ? সে

স্বীকার করবে এবং মনে মনে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বলতে থাকবে—এগুলো তো ছোট অপরাধ বড়গুলো তো এখনো ধরাই হয়নি, সে সবের পাকড়াও না জানি কত সাংঘাতিক ধরনের হবে। কিন্তু আল্লাহ্ কবীরা গুনাহ উল্লেখের পূর্বেই ক্ষমা ঘোষণা করে বলবেন—যাও, তোমার প্রতিটি গুনাহ্‌র বিনিময়ে একটি করে 'নেকী' দান করলাম। এখন সে লোক নিজের অপরাধসমূহ উল্লেখ করে আরয করবে—আল্লাহ্, আমি তো এর চাইতেও বড় আরো বহু গুনাহ করেছি সেগুলোর এখানে উল্লেখই নেই, সে সবের পরিবর্তেও আমাকে নেকী দান করুন। এটাতো হলো আখিরাতের ঘটনা। কিন্তু দুনিয়াতে يبدل الله سيأتهم حسنات (আল্লাহ্ তাদের মন্দকাজগুলোকে সৎকাজে রূপান্তরিত করে দেবেন) কথাটির বাস্তবায়ন এভাবে হবে যে, তাদের কুপ্রকৃতি কুস্বভাবকে সৎস্বভাবে পরিণত করে দেয়া হবে। যেমন কৃপণতাকে দানশীলতা, মূর্খতাকে জ্ঞানের দ্বারা বদলিয়ে দেয়া হবে। অধিকন্তু হাসানাত তথা নেক ফলের পরিবর্তনের স্বরূপ এই যে, পানিকে রক্তে—যেমন ফেরআউনের গোষ্ঠীকে রক্তের আযাবে নিপতিত করা হয়েছিল এবং রক্তকে আবার দুধেও পরিণত করা হয়। যেমন—স্ত্রীলোক এবং বকরী-গাভীর স্তনে লক্ষ করা যায়। সুতরাং এক তারিখের ফযীলত-বরকত অন্য তারিখেও দান করাটা তাঁর পক্ষে অসম্ভব কি ? তাই মাওলানা রূমী বলেছেন ঃ

گر بخواهد عين غم شادی شود

عين بند پائے ازادی شود

كيميا داری كه تبديلش كنی

گرچه جوئے خون بود نيلش كنی

—তাঁর ইচ্ছায় বিষাদের পাহাড় আনন্দে পরিণত হতে পারে, মজবুত শৃংখলিত পা মুক্ত স্বাধীনরূপে বিচরণ করা বিচিত্র নয়। তোমার হাতে রয়েছে স্পর্শ মণি, এর দ্বারা লোহাকে স্বর্ণে এমন কি তোমার পক্ষে রক্তের ধারাকে নীল নদে পরিবর্তন করে দেয়াও সম্ভব।

মহান আল্লাহ্‌র ন্যায় দূরদর্শী-সৃজনকুশলী হওয়া আর কার পক্ষে সম্ভব ? রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তামাকে সোনায় এবং রাংকে রূপায় রূপান্তরিত করা তোমাদের ন্যায় মানুষের পক্ষে যেক্ষেত্রে সম্ভব, সেক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষে নুড়ি পাথর সোনায় রূপান্তরিতকরণ অসম্ভব কি ? বস্তুত বাস্তবের প্রমাণ এই যে, সোনা, রূপা এবং অন্যান্য ধাতব পদার্থ মাটির নিচে উৎপন্ন হয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ এ মাটি থেকেই কত শত

মূল্যবান জিনিস সৃষ্টি করে রেখেছেন। এখন প্রশ্ন থাকে—বাস্তবে এমনটি হয় কি-না ? কিন্তু অন্যান্য দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত যে, প্রত্যেক শহর, প্রত্যেক জনপদে সেখানকার বাসিন্দাদের নির্ধারিত পনর তারিখেই বরকত নিহিত। হাদীসে বলা হয়েছে—

الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرن والاضحى يوم تضحون

—সে দিনের রোযাই ধর্তব্য যে দিন তোমরা রোযা রাখবে, ঈদুল ফিতর সেটাই গৃহীত হবে যে দিন তোমরা ঈদ উদ্‌যাপন করবে আর সে দিনের ঈদুল আযহাই গ্রহণীয় যেদিন তোমরা কুরবানী করবে।

আমাদের শ্রদ্ধেয় উস্তাদ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন—নিজেদের অনুসন্ধান অনুযায়ী যে দিনটিকে তোমরা রোযা রাখা শুরু কিংবা শেষ করার দিন হিসেবে সাব্যস্ত করবে আল্লাহ্‌র নিকটও সেদিনই রোযা অথবা ঈদের দিনরূপে গণ্য হবে। অর্থাৎ রমযান, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা উপলক্ষে নির্দিষ্ট সওয়াব প্রত্যেক শহরের মুসলমানগণ কর্তৃক নিজেদের অনুসন্ধানের ভিত্তিতে সে সবের নির্ধারিত তারিখেই হাসিল হবে। সুতরাং যথাযথ অনুসন্ধানের পর যে দিনটিকে শা'বানের পনর তারিখ ধার্য করত রোযা রাখবে সেটাই গ্রহণীয় এবং সে দিনের পূর্ব রাত্রি শাবানের পনর তারিখের রাত অর্থাৎ শবেবরাত হিসেবে গণ্য হবে। অতএব, অযথা তারিখের বিভিন্নতার সন্দেহে পতিত হবে না। —আল-ইউস্‌রু মাআল ইউস্‌রে, পৃষ্ঠা ৩৭

৫৫. মহিলাদের বাড়ির মধ্যে ময়লা কাপড় পরে থাকা কিন্তু বাইরে সাজসজ্জা করে বের হওয়া দূষণীয় ।

যে সমস্ত মহিলা মনের প্রশান্তি কিংবা স্বামীর মন সন্তুষ্ট রাখার উদ্দেশ্যে মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার পরিধান করে তাদের গুনাহ হবে না। কিন্তু কেবল লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে এ সবের ব্যবহার গুনাহ্‌র ব্যাপার। দ্বিতীয় প্রকারের পরিচয় হলো—নিজ বাড়িতে তারা অতি দীন-হীন নোংরা হয়ে থাকে, কিন্তু কোন আনন্দ-উৎসবে রওয়ানা দিলে শাহযাদী রূপধারণ করে বের হয়। যেমন লক্ষ্ণৌর মজদুররা সারাদিন নেংটি পরে মজদুরী করে আর সন্ধ্যাবেলা দেখ যে—ভাড়া করা পোশাক পরে পকেটে দু-পয়সা সম্বল নিয়ে এক পয়সার পানের বিড়া আর বাকি এক পয়সার ফুলের মালা গলায় দিয়ে নবাব পুত্রের ন্যায় রাস্তায় বের হয়ে পড়েছে। নিত্য দিন নতুন নতুন কাপড় পরে বের হওয়ার কি উদ্দেশ্য তা তাদের চিন্তা করা উচিত। যদি নিজের আরাম ও মনের খুশির উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তবে বাড়িতে এরূপ

জাঁকজমকের সাথে থাকা হয় না কেন ? কোন কোন মহিলা মন্তব্য করে থাকে—স্বামীর মান-সম্মান রক্ষার্থে মূল্যবান পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে আমরা পথে নামি। বেশ—যদি এ ব্যাখ্যা মেনে নেয়াও হয় তবু কথা থাকে যে, তোমাদের কথানুযায়ী স্বামীর মান রক্ষার্থে প্রথমবার যে পোশাকে অনুষ্ঠানে গিয়েছিলে সেটাই তো যথেষ্ট ছিল। এখন ক্রমান্বয়ে তিনদিন অনুষ্ঠানে হাজিরা দিতে হলে—তিনদিন তোমরা সে একই পোশাক নিয়ে বের হবে, না-কি প্রতিদিন নতুন নতুন পোশাক পরিধান করবে ? আমরা তো বরং প্রতিদিন নতুন নতুন পোশাকের ব্যবহার লক্ষ করি। এটা কেন ? স্বামীর মান রক্ষার্থে তো এক জোড়াই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু প্রত্যেক দিন নতুন জোড়া চাই, আর না-হোক অন্তত ওড়না হলেও বদলাতে হবে, যেন নতুন দেখায়। আরেকটা বিষয় মহিলাদের চরিত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়—মাহফিলে বসে স্বীয় অলঙ্কার প্রদর্শন-প্রবণতা। কেউ কেউ এ উদ্দেশ্যে মাথার কাপড় ফেলে দেয়, উদ্দেশ্য—মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত জেওর সবার চোখে পড়ুক। আবার এদের মধ্যে রক্ষণশীলরা মাথার কাপড় না ফেললেও অন্যদেরকে অলঙ্কার দেখাবার একটা না একটা বাহানা খুঁজে নেয় ; একবার চুলকায় মাথা, আবার চুলকায় কান। এর নাম 'রিয়া' বা 'প্রদর্শনীর প্রবণতা'। সুতরাং রিয়ামূলক উদ্দেশ্যে পোশাক-অলংকার ব্যবহার করা হারাম। মেয়েদের আরেকটা বাতিক হলো—মাহফিলে পৌছেই উপস্থিত জনদের জেওর-জরিনা, গয়না-গাটি এক নজর জরিপ করে ফেলবে। উদ্দেশ্য কেউ আমার উপরে তো যায়নি আর আমি নীচে পড়িনি তো ? এটাও অহংকার ও রিয়ার অংশবিশেষ। এ রোগ পুরুষদের মধ্যে বিরল। দশজন একত্র হলে কে-কি পরল, কারো খেয়ালই হয় না। এজন্য সভাস্থল ত্যাগের পর কেউ বলতেই পারে না—কার পোশাক কিরূপ ছিল। অথচ মেয়েলোকদের প্রত্যেকের স্মরণ থাকবে কার পরনে কি ছিল, কোন্‌জনের গায়ে কত অলঙ্কার, কার গহনা পরিপাটি ইত্যাদি স্মরণ রাখবে। অথচ এ উদ্দেশ্যে মূল্যবান পোশাক-আশাক পরা হারাম। —গরীবুদ্দুনিয়া, পৃষ্ঠা ২৯

৫৬. পুরুষরা নিজেকে মহিলাদের ইসলামী শিক্ষার দায়িত্বশীল মনে না করা ভুল।

পুরুষরা কেবল পার্থিব দায়িত্ব পালন করাটাই জরুরী মনে করে, স্ত্রীদের ব্যাপারে নিজেদের দীনী দায়িত্বের কথা তারা চিন্তাই করে না। বাইরে থেকে ঘরে ঢুকে খানা তৈরি হলো কিনা জোর তাকীদ দেয়া হয় কিন্তু 'নামায পড়েছ কি-না' একথা কখনো জিজ্ঞেস করা হয় না। স্বামী খেতে এসে যদি দেখে খানা তৈরির এখনো বিলম্ব অথবা তৈরি তো হয়েছে কিন্তু মনমত হয়নি তখন ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু যদি জানতে পারে

স্ত্রী এখনো নামায পড়েনি তখন স্বামীর খারাপও লাগে না কিংবা স্ত্রীর প্রতি রাগও হয় না। এমনকি কারো স্ত্রী জীবনভর নামায না পড়লেও স্বামীর পরোয়া নেই। কদাচিত কারো খেয়াল যদি হয়ও তবে দায়সারা গোছের মাত্র। "নামায কালাম পড়ে নেবে, না পড়া গুনাহ্র কাজ" ব্যস এটুকু বলেই নিজেকে দায়মুক্ত বলে মনে করে নেয়। এ-ও আবার সেসব লোকের অবস্থা যারা দীনদার হিসেবে পরিচিত। যদি তাদেরকে বলা হয় "স্ত্রীকে নামাযের শাসন কেন করা হচ্ছে না।" জবাবে তাদের উক্তি হলো—বলে তো দিয়েছি, সে না পড়লে আমি কি করতে পারি ? কিন্তু আমি বলব—ইনসাফ করে বলুন—তরকারিতে লবণ বেশি হওয়া অবস্থায় আপনার শাসনের ভূমিকা যত চোটের, স্ত্রীর নামায না পড়ার শাসনও কি সেই একই মানের ? বারবার বলা সত্ত্বেও যদি ঠিকমত লবণ না হয়, তবে দু-একবার বলেই কি আপনি নীরব হয়ে পড়েন, যেরূপ নামাযের বেলায় ? মোটেই না। বরং লবণ কম বা বেশি হলে আপনি মাথা ফাটাতে উদ্যত আর এত রাগ ফুটান যে, স্ত্রী বাধ্য হয় খামখেয়ালী ছেড়ে ঠিকমত লবণ দিতে। কেননা তিনি যে ভীষণ রাগী মানুষ।

বন্ধুগণ! নামাযের জন্য তো আপনি কখনো কড়া মেজায দেখান না যাতে স্ত্রী বুঝতে পারে এর জন্য আপনি বড় অসন্তুষ্ট। এক্ষেত্রেও যদি আপনার ভূমিকা তা-ই হতো, তবে গুরুত্ব না দিয়ে স্ত্রীর উপায় ছিল না। একবার বলায় কাজ না হলে দ্বিতীয়, তৃতীয়বার বলতেন। তাতেও কাজ না হলে রাগ করতেই থাকতেন এবং বিভিন্ন পন্থায় নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ ঘটাতেন। যথা—স্ত্রীর সাথে শোয়া বর্জন করে চলতেন অথবা তার হাতের পাক খাওয়া পরিহার করতেন। অতিরিক্ত লবণের বেলায় রাগে কাজ না হলে নীরব না থেকে আপনি বলতেই থাকেন। এ ক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা এমন হয় না যে, এতবার বলা সত্ত্বেও যখন কাজ হচ্ছে না, তাহলে চুপ থাকা ছাড়া উপায় কি ?

বন্ধুগণ ! ইনসাফ করে বলুন, নামাযের বেলায় যেভাবে মনকে বুঝিয়ে নিয়েছেন—খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও কি নিজেকে একই ধরনের প্রবোধ দেয়া হয় ? কখনো না। এটা আপনাদের নিছক দুর্বলতা বৈ নয়। স্ত্রীকে নামাযী বানাতে আপনাদের অকৃত্রিম আগ্রহ থাকলে এটা কোন কঠিন কাজ নয়। কারণ স্ত্রী শাসক নয়, স্বামী কর্তৃক শাসিত। সুতরাং আপন মতলব ও স্বার্থে তো তার ওপর ক্ষমতার পুরোপুরি ব্যবহার করাই হয় কিছু দীনের ব্যাপারে সে ক্ষমতা আদৌ প্রয়োগ করা হয় না। —হুকূকুল বাইত, পৃষ্ঠা ৬

৫৭. বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা নারীজাতির পক্ষে বিষ তুল্য।

কেউ কেউ নিজ কন্যাদের মুক্ত, বেপরোয়া মহিলার মাধ্যমে শিক্ষাদানে আগ্রহী। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত যে, মানুষের মধ্যে সহকর্মী-সহপাঠীর চরিত্র ও আবেগের প্রভাব প্রতিফলন অনিবার্য। বিশেষত সে সহযোগী যদি উপরস্থ ব্যক্তি হয়। বলা বাহুল্য—উস্তাদের মধ্যে এসব বিশেষণ অধিক মাত্রায় বিদ্যমান। এমতাবস্থায় মেয়েদের মধ্যে সে বেপরোয়া ও স্বাধীন মনোভাবের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। আমার মতে এর ফলে যাবতীয় কল্যাণের চাবিকাঠি নারীর লাজ-নম্র চরিত্র-মাধুর্য আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় তাদের থেকে যেকোন কল্যাণের আশা আর অকল্যাণের নিরাশা অর্থহীন। কেননা প্রবাদ রয়েছে ঃ اذا فاتك الحياء فافعل ما شئت অর্থাৎ, লাজ্জা হারিয়ে ফেললে তুমি যা ইচ্ছা তা-ই করতে পার । কথাটা ব্যাপক অর্থবোধক কিন্তু আমার মতে পুরুষ অপেক্ষা নারীর ক্ষেত্রে ব্যাপকতর। কারণ পুরুষের মধ্যে বিবেকের বাধা তবু কিছুটা থাকে কিন্তু নারী চরিত্রে বিবেকের স্বল্পতা হেতু কোন বাধাই থাকে না। অনুরূপ শিক্ষিকা যদি সেরূপ নাও হয় কিন্তু সহপাঠী মেয়েরা এ ধরনের হলে এর দ্বারাও ক্ষতির আশংকা প্রবল। এ বক্তব্য দ্বারা বর্তমানে প্রচলিত দুটি বিষয় উত্তমরূপে ফুটে ওঠে। এক ঃ সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা, যাতে দৈনিক বিভিন্ন মত ও পথের ছাত্রীর সমাবেশ ঘটে। শিক্ষয়িত্রী যদি মুসলমানও হয়, যাতায়াত করে পাল্কীতে এবং পর্দাঘেরা বাড়িতে থাকে তা সত্ত্বেও অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে এখানে এমন সব কারণ সৃষ্টি হয় যার দ্বারা চরিত্রের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সাহচর্য চরিত্র হননকারী প্রমাণিত হয়। আর শিক্ষিকা যদি স্বাধীনমনা এবং প্রবঞ্চক প্রবৃত্তির হয় তবে তো রক্ষাই নেই। দুই ঃ কোথাও যদি দৈনিক কিংবা সাপ্তাহিক রুটিন অনুযায়ী শিক্ষার উদ্দেশ্যে মিশনারী মেমদের সান্নিধ্যে আসার এবং মেলামেশার সুযোগ অব্যাহত থাকে, তবে ইজ্জত আবরু তো দূরের কথা ঈমান রক্ষাই দায় হয়ে পড়ে। পরিতাপের বিষয়—কেউ কেউ এটাকে গৌরবজনক মনে করে এদেরকে আপন বাড়িতে স্থান দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। আমার মতে শিক্ষয়িত্রী হিসেবে মুসলমান কোন বৃদ্ধা মহিলা পর্যন্ত জীবনে একবারের জন্যও এ সকল মেমদের সাথে কথাবার্তা বলার সুযোগ লাভ করাটা মারাত্মক ক্ষতিকর সে ক্ষেত্রে প্রভাবান্বিত কচি বালিকাদের তো প্রশ্নই আসে না। এসব ক্ষতির কথাই ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা বালিকাদের সব চাইতে নিরাপদ শিক্ষা ব্যবস্থা হলো—দু-চারটি বালিকা নিজেদের ঘনিষ্ঠ ও নিরাপদ স্থানে একত্রিত হয়ে শিক্ষা লাভ করবে। ভাগ্যক্রমে

উপযুক্ত অবৈতনিক কোন শিক্ষয়িত্রী যোগাড় করা গেলে অতি উত্তম এবং এ শিক্ষা অধিক ফলপ্রসূ আর বরকতময় প্রমাণিত হয়। প্রয়োজনে এ জাতীয় শিক্ষয়িত্রী সবেতন নিয়োগ করাতেও ক্ষতি নেই। কোথাও যোগ্য শিক্ষয়িত্রীর অবর্তমানে বাড়ির পুরুষই আপাতত শিক্ষা দেবে। এতো গেল নারী শিক্ষার পদ্ধতিগত আলোচনা।

অতঃপর তাদের ক্ষেত্রে পাঠ্যসূচী হবে—প্রথমে সহীহ-শুদ্ধ কুরআন পাঠ, অতঃপর সহজ-সরল ভাষায় ইসলামের সকল দিক এবং প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা দেয়া। আমার মতে দশ খণ্ড বেহেশতী জেওরই এর জন্য যথেষ্ট। পুরুষ শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষাদানের বেলায় লজ্জাজনক মাসআলাসমূহ উপেক্ষা করে যাওয়া বাঞ্ছনীয়। স্ত্রীর মাধ্যমে সেসব বুঝিয়ে দেবে। এটাও যদি সম্ভব না হয়, তবে নির্দিষ্ট স্থানগুলি এখনকার মত রেখে দেবে মেয়েরা বড় হলে নিজেরাই বুঝে নেবে। স্বামী আলিম হলে তার কাছে শিখে নেবে অথবা স্বামীর মাধ্যমে কোন আলিমের নিকট থেকে জেনে নেবে। (বেহেশতী জেওরের পঠন পদ্ধতিতে আমি এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ লিখে দিয়েছি। কিন্তু কেউ কেউ সেটা না দেখেই প্রশ্ন করে বসে—পুরুষদের পক্ষে এ জাতীয় মাসআলা শিক্ষাদানের উপায় কি ? কাজেই কিতাবের ভূমিকায় এ সম্পর্কে না লেখাই মনে হয় সমীচীন ছিল। এদের অপক্ক বিবেক দেখে অবাক হতে হয়।) বেহেশতী জেওরের শেষাংশে মহিলাদের জন্য উপকারী কিছু কিতাবের নামোল্লেখ করা হয়েছে, সে সব পাঠ্যপুস্তকরূপে পড়ানো দরকার। সবগুলো সম্ভব না হলে প্রয়োজন পরিমাণ ক্লাসে পড়ানো দরকার, অবশিষ্টগুলি পরে অধ্যয়ন করতে থাকবে। শিক্ষার সাথে সাথে বাস্তব আমলের প্রতিও দৃষ্টি রাখা উচিত। সাথে সাথে মেয়েদের মনে শিক্ষাদানের আগ্রহ সৃষ্টি হয় এ ধরনের ব্যবস্থাও থাকা বাঞ্ছনীয়, তারা যেন সারা জীবন ইল্‌ম চর্চায় আত্মনিয়োগের সুযোগ পায়। অতএব, এভাবে ইল্‌ম ও আমলের মানসিকতা গড়ে উঠবে। অধিকন্তু উপকারী ও শিক্ষামূলক কিতাবাদি অধ্যয়নে মেয়েদেরকে উদ্বুদ্ধ করা উচিত। প্রয়োজনীয় পাঠ্যসূচী সমাপনান্তে যোগ্যতার ভিত্তিতে আরবী শিক্ষার প্রতি তাদের আকৃষ্ট করা উচিত। কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ্ মূল ভাষায় বোঝার যোগ্যতা যেন তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে। কোন কোন মেয়ে কুরআনের অনুবাদ পাঠে আগ্রহী। আমার মতে বোঝার ক্ষেত্রে তারা অধিক মাত্রায় ভুল করে থাকে। তাই সবার জন্য এটা উপযোগী নয়।

এতক্ষণের আলোচনা সম্পৃক্ত ছিল কেবল পড়ার মধ্যে। বাকি লেখা সম্পর্কে কথা হলো—তাদের মন-মানসিকতায় বেপরোয়া ও নির্ভয়ের প্রবণতার লক্ষণ দৃষ্ট না হলে ক্ষতি নেই। পারিবারিক প্রয়োজন পূরণে লেখার দরকার রয়েছে। কিন্তু খারাপের

আশংকা থাকাবস্থায় কল্যাণ লাভ অপেক্ষা অকল্যাণ থেকে আত্মরক্ষার গুরুত্ব অসীম। এমতাবস্থায় মেয়েদের লেখা শেখানো এবং লিখতে দেয়া উচিত নয়। নারী শিক্ষা সম্পর্কিত প্রশ্নে জ্ঞানী মহলের মতবিরোধের এটাই হলো সঠিক ফয়সালা।

—হুকূকুল বাইত, পৃষ্ঠা ৩৮

বহুল প্রচলিত ভুল সংশোধন

৫৮. পীর অপেক্ষা মাতা-পিতার হক বেশি।

আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে—পিতা-মাতার হক বেশি না পীরের ? জবাবে আমি বলেছি—পিতা-মাতার হক অগ্রগণ্য। অবশ্য لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (সৃষ্টিকর্তার নাফরমানী করে মাখলুকের আনুগত্য স্বীকৃত নয়)। অর্থাৎ পীর যদি শরীয়তের বিধান মোতাবিক হুকুম করেন আর মাতা-পিতার নির্দেশ হয় শরীয়তের বিরোধী এমতাবস্থায় পিতা-মাতার নয় পীরের আনুগত্য জরুরী। পীর যেহেতু শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী পথনির্দেশ করেন, কাজেই তার আনুগত্য অগ্রাধিকারের দাবিদার। কিন্তু এটা হক বা অধিকার হিসেবে নয়। হক হিসেবে আল্লাহ্‌র পরই মাতা-পিতার স্থান। বর্তমানের পীররাও নিজেকে মালিক মনে করেন। আল্লাহ্‌র শুকরিয়া যে, এতদঞ্চলের গদীনশীন পীরদের ভূমিকা তেমন আপত্তিজনক নয়। পূর্বাঞ্চলীয় জনৈক পীর মেয়ে মহলে গিয়ে আস্তানা গাড়ত। আল্লাহ্ এ জাতীয় পীরদের নিপাত করুন। সাথে সাথে তিনি একজন মস্তবড় বুযুর্গ এবং শ্রেষ্ঠ কুতুব হিসেবেও খ্যাতিমান ছিলেন। তার মুরীদের সংখ্যা ছিল কয়েক লাখ, হিন্দুরা পর্যন্ত তার মুরীদ ছিল। বলা বাহুল্য, পূর্ববর্তী যুগে ফকীর, দরবেশের জন্য মুসলমান হওয়া ছিল অপরিহার্য। আর বর্তমানে কাফেরও সূফী-দরবেশ হতে কোন বাধা নেই। এ পরিস্থিতি এসব ডাকাতের সৃষ্টি। কাফেররাও এদের মুরীদ হওয়ার যোগ্যপাত্র। দাজ্জালের প্রতি নিশ্চয়ই এরা বিশ্বাস স্থাপনে কুণ্ঠিত হবে না। কারণ সে ভেল্কিবাজী ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বিরাট অধিকারী হবে। এদের দৃষ্টিতে যেহেতু সূফীর জন্য মুসলমান হওয়া অপরিহার্য নয়, কাজেই নির্বিঘ্নে এরা দাজ্জালকে ইমাম স্বীকার করে নেবে। কিন্তু যে বিশ্বাস রাখে যে, যেখানে শরীয়ত অনুপস্থিত তথায় কিছুই নেই, তার নিকট কারামত মূল্যহীন, শরীয়তের আনুগত্যকে সে সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দিবে। আর দাজ্জাল হবে যেহেতু কাফের, তাই এর ফিতনা থেকে সে নিরাপদ থাকবে।

বন্ধুগণ! দাজ্জালের প্রকাশ বেশি দূরে নয়। কাজেই অতি সত্বর নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস বিশুদ্ধ করে নিন। এ কথার অর্থ এই নয় যে, আমার নিকট ইলহামের আগমন ঘটেছে বরং পরিস্থিতি আভাস দিচ্ছে যে, দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের সময় অতি নিকটবর্তী। স্বয়ং মহানবী (সা) সন্দেহ করতেন—আমার সময়েই না জানি তার আত্মপ্রকাশ ঘটে। কাজেই আমাদের সময়ে বের হওয়ার আশংকা উড়িয়ে দেয়া যায় না। অতএব, নিজের আকীদা সংশোধনে তৎপর হওয়া বিশেষ জরুরী এবং শরীয়ত বিরোধী ব্যক্তির ভক্ত-অনুরক্তের দলে মোটেই শামিল হওয়া চাই না। এরপর আপনারা নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করবেন।

মোটকথা—আজকালের পীররা ধারণা করে—মুরীদরা আমাদের মালিকানা সম্পত্তি, তাই মুরীদকে তারা মাতা-পিতা, স্ত্রী-সন্তান সকল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। স্মরণ রাখবে, যদি পীর বলে রাতে নফল পড় আর পিতা বলে, না শুয়ে থাক। এক্ষেত্রে পিতার আনুগত্য অগ্রগণ্য। অবশ্য পিতা যদি শরীয়তের পরিপন্থী কোন নির্দেশ দেয় এমতাবস্থায় তার আনুগত্য জায়েয নয়। কারণ শরীয়তের দাবি সর্বাগ্রে পালনীয়। মাতা-পিতার হক অনুধাবনের জন্য জুরাইজের ঘটনা প্রণিধানযোগ্য। প্রাচীনকালে বনী ইসরাঈল গোত্রে জুরাইজ নামক জনৈক দরবেশ বনের মধ্যে নির্জনবাস গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী শরীয়তে এ-বিধান জায়েয ছিল। অবশ্য আমাদের শরীয়তে এ ব্যবস্থা কাম্য নয়। নির্জনবাস সম্পর্কে বর্তমান পরিস্থিতি দৃষ্টে একটা মোটা কথা বলে রাখি, বর্তমান যুগের পরিবেশ অনুযায়ী নির্জনবাস গ্রহণ দ্বারা মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। কারণ এ ধরনের বনবাসী ব্যক্তিকে লোকেরা বড় বিরক্ত করে, কিন্তু মসজিদের কোণে বসা ব্যক্তিকে কেউ জিজ্ঞেস পর্যন্ত করে না। দ্বিতীয়ত মানব সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিঃসঙ্গ ইবাদত দুর্বলতার লক্ষণ। কবির ভাষায় ঃ

زاهد نه داشت تاب جمال پری رخان

کنجے گرفت وترس خدارا بهانه ساخت

—পরীর মত রূপসীর রূপের চমক সহ্য করার ক্ষমতা দরবেশের নেই, তাই সে খোদাভীতির ছলে নিঃসঙ্গ জীবন বেছে নিয়েছে। বীরত্বের কথা হলো—সমাজের সকলের সাথে মিলে মিশে থাক আর আপন কাজে লিপ্ত থাক। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف

অর্থাৎ দুর্বল ঈমানদার অপেক্ষা সবল মুমিন অধিক উত্তম। আর জংগলে কেউ যদি বিরক্ত না করে তো উত্তম কথা, কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু শরীয়তের সীমালংঘন করা হারাম। এরই প্রেক্ষিতে কবির উক্তি প্রণিধানযোগ্য ঃ

بزهدو ورع کوش وصدق وصفا

ولیکن میفزائے بر مصطفی

خلاف پیمبر کسے ره گزید

که هر گز بمنزل نخواهد رسید

مپندار سعدی که راه صفا

توان یافت جزبر پئے مصطفے

—তাকওয়া, পরহেজগারী, সততা, আত্মশুদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে শত চেষ্টা কর, কিন্তু নবী মুস্তফা (সা)-কে অতিক্রম করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। পয়গম্বরের বিপরীত পথের পথিকের পক্ষে কখনো গন্তব্যস্থানে পৌঁছা সম্ভব নয়। হে সাদী! নবী মুস্তফা (সা)-এর আনুগত্য ব্যতীত হিদায়েতের পথ পাওয়া যাবে এ ধারণা কখনো করো না।

অর্থাৎ যা কিছু হাসিল করার একমাত্র মহানবী (সা)-এর আনুগত্যের মাধ্যমেই লাভ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসের মর্ম পুরোপুরি বুঝে না আসলে সাহাবীগণের অবস্থা লক্ষ কর। কেননা তাঁরা ছিলেন নবী জীবনের বাস্তব নমুনা।

যা হোক, জুরাইজ একজন আবেদ লোক ছিলেন। একবার নিজের ইবাদতখানায় নফল নামায পড়াকালে তাঁর মা সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে ডাকেন। এখন তিনি এই ভেবে বিচলিত হয়ে পড়েন যে, জবাব দিবেন কি-না। কারণ জবাব দিলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আর জবাব না দিলে মায়ের বিরাগভাজন হওয়ার আশংকা।

অবশেষে উত্তর না দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এদিকে দু-তিনবার ডাকার পর মা তাঁর প্রতি ঃ اللهم لا تمته حتی تریه وجوه المومسات (হে আল্লাহ্! কোন যিনাকারিণী নারীর মুখ না দেখা পর্যন্ত যেন তার মৃত্যু না হয়।) এ অভিশাপ উচ্চারণ করে মা ফিরে যান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ ঘটনা বর্ণনার পর ইরশাদ ফরমান ঃ لو کان فقیها لاجاب امه "ফকীহ্ হলে নিশ্চয়ই সে মায়ের জবাব দিত।" এ উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নামায নফল ছিল। কেননা সর্বসম্মতিক্রমে ফরয নামায ত্যাগ করা জায়েয নয়। অবশ্য

আগুনে পুড়ে অথবা গর্তে পড়ে যাওয়া ইত্যাদির ন্যায় বিপন্নকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ফরয নামায ত্যাগ করা ওয়াজিব, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি যেই হোক।

বন্ধুগণ! আপনারা শরীয়তের রহমত ও অনুগ্রহপূর্ণ বিধান লক্ষ করুন। এর সৌন্দর্য ও কল্যাণকামিতা আপনাদের অনুভূতি-উপলব্ধির আওতাধীন নয় বিধায় আপনাদের দ্বারা শরীয়তের যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব নয়। এর অবস্থা বরং ঃ

زفرق تا بقدم هر كجامى نگرم

كرشمه دامن دل ميكشد كه جا اينجاست

—মাথা হতে পা পর্যন্ত যেখানেই তাকাই না কেন তাঁর মহত্ত্ব ও অনুগ্রহ মনকে আকর্ষণ করে নির্দেশ দেয় যে, তোমার অভীষ্ট লক্ষ্যবস্তু এখানেই।

শরীয়ত এমনি সুন্দর যে, এর যেকোন অঙ্গের প্রতি তাকাও দেখবে মনোহারী, যে ভঙ্গির প্রতি দৃষ্টিপাত করবে দেখতে পাবে তাই চিত্তাকর্ষক। আপনারা অবশ্যই লক্ষ করেছেন—শরীয়তের বিধান কত জরুরী ও বাস্তবসম্মত যে, বিপন্নের সাহায্যার্থে ফরয নামায পর্যন্ত ছেড়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছা অনিবার্য। অধিকন্তু বিনা কারণে ডাকলেও নফল নামায ত্যাগ করে মাতা-পিতার আহবানে সাড়া দেয়া শরীয়তের বিধান। কিন্তু শর্ত হলো—তারা যদি সন্তানের নামাযের খবর অবগত না থাকে। বস্তুত জুরাইজ ফকীহ ছিলেন না বিধায় ডাকে সাড়া দেননি। তাই মায়ের বদ্‌দোয়া প্রাপ্ত হন। এর ফল হলো এই যে, পাশেই চরিত্রহীনা এক নারী ছিল। অন্য কারো সাথে দুষ্কর্মের দরুন সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। কতিপয় লোক ছিল জুরাইজের শত্রু। তারা রমণীকে বলল—তুমি জুরাইজের নামোল্লেখ করে বলবে—এটা তারই কর্ম, এ সন্তান জুরাইজের। হতভাগী তাই করে। ফলে জনগণ উত্তেজিত হয়ে ইবাদতখানা ধ্বংস করতে এবং জুরাইজকে শারীরিক নির্যাতনের শিকারে পরিণত করতে উদ্যত হয়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের এ আচরণের মূলে কোন কারণ আছে কি ? লোকেরা বলল —তুমি রিয়াকার, ইবাদতখানা নির্মাণ করে এর মধ্যে বসে ব্যভিচার কর। অমুক রমণীর সাথে তুমি যিনা করেছ এবং তার সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। তিনি অতঃপর ইবাদতখানা থেকে নিচে নেমে আসেন। তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র প্রিয় ও মকবূল বান্দা। আল্লাহ্‌র রহমতে ঢেউ ওঠে এবং তাঁর কারামাতের প্রকাশ ঘটে। হযরত জুরাইজ রমণীর শিশু পুত্রকে প্রশ্ন করলেন—বল্, তুই কার পুত্র ? সে বলল ঃ আমি অমুক রাখালের ছেলে। হাদীসে বর্ণিত আলোচ্য ঘটনা দ্বারা মায়ের হক ও মর্যাদা পরিষ্কার হয়ে ওঠে কিন্তু ইমামগণের ইজমা তথা সর্বসম্মত মত এই যে,

পীরের আহবানে নফল নামায ত্যাগ করাও জায়েয নয়। সুতরাং পীরের হক মাতা-পিতার হকের অধিক নহে। তাহলে পীর সাহেব তো খাসা লোক যে, পরের পালা ধন হাতিয়ে নিলেন। তাহলে পীর-মুরীদের রহস্য কি এই ?

—ওয়ায—আযলুল জাহেলিয়াহ্, পৃষ্ঠা ৫৭

৫৭. 'ছোট বাচ্চার প্রাণ যায় যাক কিন্তু রোযা সম্পূর্ণ করতেই হবে'—এ ধরনের আমলের কোন সারবত্তা নেই।

এক জায়গায় দেখতে পেলাম বাড়ির সব মেয়েরা মিলে একটি কচি মেয়েকে রোযা রাখিয়েছে। এখন সে রোযা নষ্ট করে দেয় কিনা তার সার্বক্ষণিক পাহারার ব্যবস্থা এমনকি পায়খানায় গেলেও পিছনে পাহারাদার খাড়া। অর্থাৎ বাচ্চার প্রাণ গেলেও রোযা সম্পূর্ণ হওয়া চাই। কিন্তু কোন কোন সময় এহেন রোযা বাচ্চাকে কবরে পৌঁছে ছাড়ে। একবারের ঘটনা, কোন এক ধনীর দুলালকে রোযা রাখানো হয়। গরমের দিন ছিল, দুপুর পর্যন্ত তো বেচারা কোন মতে সামলে নেয়। কিন্তু আসরের সময় লাচার হয়ে পড়ে। বিত্তবান পিতা পুত্রের রোযা খোলা উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শী দাওয়াত করে জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবের ব্যবস্থা করল। বাচ্চাকে বার বার ধৈর্যের উপদেশ আর সান্ত্বনা বাণী শুনানোর পুণ্যকাজ চলতে থাকে—এই তো হয়ে গেল, আরেকটু সবর কর ইত্যাদি। কিন্তু কচি প্রাণে এতবড় চোট সামলানোর ক্ষমতা কোথায় ? সবাইকে বহু অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও কোন জালিমের অন্তরে কচি প্রাণের প্রতি দয়া হলো না। এদিকে ধনী পিতা অন্যান্য খাদ্য-সামগ্রীর মধ্যে মটকা ভরা পানিতে বরফ দিয়েও ইফতারের বিপুল আয়োজন করল। নিরুপায় ছেলে অবশেষে পরান ঠাণ্ডা করার উদ্দেশ্যে মটকার ধারে পৌঁছে। আর তার সাথে লেপটানোর সাথে সাথেই প্রাণ বের হয়ে যায়। নিষ্ঠুর কসাই পিতা-মাতাকেই এখন সাজা ভোগ করতে হলো।

বন্ধুগণ! শরীয়তের তো বিধান হলো—প্রাণের আশংকা দেখা দিলে বয়স্ক যুবকের পক্ষেও রোযা খুলে ফেলা ওয়াজিব। কিন্তু রেওয়াজীদের নিকট নিষ্পাপ কচি শিশুর পর্যন্ত অনুমতি নেই। আফসোস! তোমাদের এমন রোযার আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল তোমাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক দয়াশীল। কুরআনের বাণী ঃ النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم —নবী মু'মিনদের প্রাণাপেক্ষা অধিকতর দয়াশীল। সুতরাং এহেন পরিস্থিতিতে বয়স্কদের প্রতি রোযা ভাঙ্গার নির্দেশ, সেক্ষেত্রে চার-পাঁচ বছরের কচি শিশু কোন্ খাতের হিসেবে। এ জন্য আমি বলি, শরীয়তের বিধানে এত দয়া, এত সহজ-সারল্য বিদ্যমান, যা আপন সত্তার প্রতি তোমরা নিজেরাও দেখাতে সক্ষম নও। —আযলুল জাহিলিয়াহ্, পৃষ্ঠা ৫৭

৬০. ফেরেশতাগণ পয়গম্বর হিসেবে কেন প্রেরিত হননি ? মহানবী (সা) মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ।

১. এ প্রসঙ্গে কুরআনের আয়াত ঃ لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة প্রণিধানযোগ্য। যার মর্ম হলো—আল্লাহ্ পাক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সত্তার ভিতর তোমাদের তথা গোটা মানবজাতির কল্যাণে উত্তম আদর্শ নিহিত রেখেছেন। আদর্শ বা নমুনা দেয়ার উদ্দেশ্য এটাই যে, এই ছাঁচে অন্যান্য জিনিস তৈরি হোক। জনৈক বুযুর্গের মুখে এ সম্পর্কে আমি সূক্ষ্ম জবাব শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ মহানবী (সা)-এর সাথে আমাদের দৃষ্টান্ত এরূপ—যেন এক ব্যক্তি সেলাই করা আচকানের নমুনা দিয়ে দর্জির নিকট আচকান সেলাই করতে দিল। দর্জি পুরো আচকানের নমুনা অনুযায়ী মাপজোখ দিয়ে সেলাই করে নিয়ে আসল। সেলাইতে কোন ত্রুটি নেই। সবই ঠিক, কিন্তু একটা হাতা কেবল এক বিঘত ছোট করেছে। এখন এ আচকান মালিকের হাতে দিলে মালিক কি বলবে ? মালিক কি গ্রহণ করবে, না-কি তার মুখের উপর ছুঁড়ে মারবে ? জবাবে দর্জি বলে—জনাব, সবইতো ঠিক, একটা হাতাই তো কেবল ছোট। এমতাবস্থায় আপনারা কি মনে করেন মালিক খুশি মনে গ্রহণ করবে ? মোটেই না। সম্পূর্ণ কাপড়ের দাম উসুল করে নিবে। সুতরাং উত্তমরূপে স্মরণ রাখুন! মহান আল্লাহ্ পূর্ণাঙ্গ আইনের বিধান নাযিল করেছেন এবং বাস্তব নমুনাস্বরূপ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তৈরি করেছেন। এখন আপনাদের আমল নমুনা অনুসারে হলে তো ঠিকই আছে, নতুবা ভুল এবং গ্রহণের অযোগ্য বিবেচিত হবে। আপনাদের নামায, যিক্র রাসূলের আদর্শ অনুযায়ী হলে গ্রহণযোগ্য, নতুবা মূল্যহীন, উল্টো গুনাহ হবে। লক্ষ করুন, নামাযের মধ্যে দুটি সিজদার স্থলে এক সিজদা করা হলে নামায বাতিল গণ্য হবে। অর্থাৎ সিজদা দুটোই করতে হবে। অনুরূপ গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াতকারী সওয়াবের পরিবর্তে উল্টো গুনাহগার হবে। একইভাবে আল্লাহ্র নির্দিষ্ট নামের পরিবর্তে নিজের তরফ থেকে নাম রাখা কারো পক্ষে জায়েয নয়। আপনার রোযা, হজ্জ, যাকাত সবই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদর্শ অনুযায়ী হওয়া অপরিহার্য। তাঁর নমুনা বহির্ভূত কোন আমল আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। এসব হলো ইসলামের যাহেরী আমল। বাতেনী ও আধ্যাত্মিক আমলের অবস্থাও একই ধরনের—পারস্পরিক আচার-আচরণ, লেনদেন সামাজিক ব্যবহারের ক্ষেত্রেও একই বিধান। আল্লাহ্ কোন ফেরেশতাকে আমাদের প্রতি রাসূল হিসেবে না পাঠানোর রহস্য এখানেই যে, ফেরেশতা আমাদের নমুনা হওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ তাদের খাওয়া, পরা, বিয়ে-শাদী , সমাজ-নমায ইত্যাদির কোন প্রয়োজন

পড়ে না। এসব হুকুমের বেলায় তাদের ভূমিকা কেবল আমাদেরকে পড়ে শোনানোতেই সীমিত থাকত। বস্তুত এটুকু দায়িত্ব আমাদের নিকট শুধু কিতাব পাঠালেও চলত যে, হুকুম-আহকাম পাঠ করে অথবা অপরের মুখে শুনে আমল করে নিতাম। ফেরেশতা নাযিল হওয়া দ্বারা কিতাব নাযিল হওয়া অপেক্ষা অধিক লাভের কিছুই ছিল না। আল্লাহ্ তা করেন নি। তিনি আমাদের মধ্য থেকেই পয়গম্বর পাঠিয়েছেন। যিনি খাওয়া, পরা, বিয়ে-শাদী, সুখ-দুঃখ, সমাজ-জামাতে আমাদের সাথী। তাঁর সাথে বিধান সম্বলিত আসমানী গ্রন্থও দেয়া হয়েছে। তিনি নিজে এর ওপর আমল করেছেন, যেন আমাদের পক্ষে সহজ হয়, আদর্শ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ বলেনঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلاَّ اِنَّهُمْ لَيَاكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِىْ الْاَسْوَاقِ ٠

—তোমার পূর্বে যত রাসূল আমি পাঠিয়েছি তাঁরা মানুষের ন্যায় পানাহার, চলাফেরা এবং সমাজবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ٠ অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে হুকুমসহ ফেরেশতা পাঠানো হলে সেও মানব গোষ্ঠীভুক্ত পুরুষই হতো। নতুবা আদর্শ ফুটিয়ে তুলতে না পারার কারণে তার দ্বারা মানুষের হেদায়েত লাভ সম্ভব ছিল না। এ পর্যায়ে মহানবীর গুণ-বৈশিষ্ট্য ফেরেশতা অপেক্ষা অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও হিকমতে ইলাহীর ইচ্ছা হলো তাঁকে মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা। উদ্দেশ্য—মানবীয় সকল কাজে-কর্মে যেন তাঁর জীবন চরিত আদর্শ ও নমুনার দিশারী হয়ে বিরাজ করে। লক্ষ করুন! মানবীয় সকল সমস্যা তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছে। তিনি স্বয়ং বিয়ে করেছেন, সন্তানের বিয়ে দিয়েছেন। তাঁর উপস্থিতিতেই কয়েকজন সন্তান চিরবিদায় নিয়েছেন। সন্তানহারার মর্মযাতনা তাকে ভোগ করতে হয়েছে। কাজেই আপনজনের বিয়োগ-ব্যথার অঙ্গনেও তিনি আমাদের আদর্শ। এখন লক্ষ করুন! আমাদের কোন্ কাজটা তাঁর সে নমুনা-সদৃশ। আনন্দ কিংবা যাতনা কোন অবস্থাতেই আমরা আদর্শের প্রতি তাকাই না যে, এর সাথে আমাদের আচরণ খাপ খায় কি-না। তাই সে দর্জির ঘটনা মনে রাখুন—আধা হাত ছোট হওয়ার দরুন যার আচকান মুখের ওপর ছুঁড়ে মারা হয়েছিল। আর সেলাই না করে আসল কাপড়ই নষ্ট করে যদি মালিকের সামনে হাযির করে, তখন সে কি পরিমাণ সাজার যোগ্য হবে ? উপরন্তু মালিকও যখন সর্বশক্তিমান। আল্লাহ্র কসম! আমাদের আমলের অবস্থাও তদ্রূপ। আসল নমুনা থেকে দূরে সরে বিকৃত আমল আল্লাহ্র সামনে পেশ করছি। এসব আমার অতিরঞ্জন নয়। লক্ষ করুন, আচকানের কাপড় অবিকৃত অবস্থায় থাকা শর্ত। আর বিকৃতি দ্বারা আচকান তো দূরের কথা

কাপড় তৈরির মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। তদ্রূপ আমলের পরিশুদ্ধির জন্য ঈমান পূর্ব শর্ত। সুতরাং ঈমান হারিয়ে কারো আমলের প্রচেষ্টা বিকৃত কাপড় দ্বারা আচকান সেলাইয়ের সমতুল্য। —মুনাযাআতুল হাওয়া, পৃষ্ঠা ৬৩

২. মহানবী (সা)-এর চাল-চলন, অবস্থা-ব্যবস্থা সবকিছুকে নিজেদের সাথে সার্বিকভাবে তুলনা করা একটা ভুল চিন্তাধারা। বস্তুত তাঁর অবস্থা হলো بشر لا كالبشر ولكن كالياقوت بين الحجر অর্থাৎ তিনি মানুষ বটে কিন্তু সাধারণ মানুষতুল্য মানুষ নন। বরং মানুষের মধ্যে তাঁর অবস্থান শিলাস্তূপে মণি-কাঞ্চনের ন্যায়। অর্থাৎ জাতে অভিন্ন ও সমগোত্রীয় হওয়া সত্ত্বেও ইয়াকুত এবং শিলা খণ্ডের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। এখন কেবল সমজাতীয় হওয়ার ভিত্তিতে ইয়াকুতকে অন্যান্য পাথরের সাথে কেউ তুলনা করতে চাইলে বলতে হবে—তার বিবেক পাথরে পিষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই কোন মানুষ জ্ঞানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিজেদের সাথে তুলনা দেয়া চলে না। সকল মানুষ কি একই পর্যায়ের ? লক্ষ কর. কৃষ্ণাঙ্গ, নিগ্রো, তদুপরি চোখ টেরা সেও মানুষ, আবার অনুপম রূপের অধিকারী দ্বিতীয় ইউসুফ সেও মানুষ। কিন্তু উভয়ে কি সমপর্যায়ের, এদের একজনকে অপরজনের সাথে তুলনা করা কি সঙ্গত ? আদৌ না। এদের দু-জনের মধ্যে এত ব্যবধান যে, উক্ত দ্বিতীয় ইউসুফকে দর্শনের পর কেউ নিগ্রো লোকটিকে দেখে মানুষ বলে স্বীকারই করবে না, যেহেতু তার দৃষ্টিতে মানুষ বলতে তখন একমাত্র সুন্দর মুখটিকে বোঝায়। তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও এমনি এক অদ্বিতীয় মানব যার নূরানী জ্যোতির্ময় চেহারা দর্শনকারীর দৃষ্টিতে তুমি-আমি মানুষ হওয়া তো দূরের কথা, আমাদেরকে সে গরু-গাধা তুল্য মনে করবে। এ প্রশ্নে মানুষ তিন পর্যায়ে বিভক্ত। একশ্রেণীর লোক তো তাঁকে মানুষের ঊর্ধ্বে উঠিয়ে খোদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে আগ্রহী। দ্বিতীয় শ্রেণী তাঁকে নিজেদের ন্যায় সাধারণ মানুষের কাতারে নামিয়ে আনার পক্ষপাতী। এ উভয়শ্রেণী ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ। তৃতীয় দল মধ্যমপন্থী। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মানুষ মনে করে কিন্তু সৃষ্টির সেরা মানুষ। তারা মহানবীর শানে উচ্চারণ করে ঃ

بشر لا كالبشر بل كالياقوت بين الحجر

—তিনি মানুষ কিন্তু অসাধারণ বরং শৈল জগতে ইয়াকূত আর মণি-কাঞ্চনসম। বাস্তবে ঘটনাও তাই। কবির ভাষায় ঃ

گفت اینک ما بشر ایشاں بشر

ما وایشاں بستہ خوابیم وخور

این ندا نستند ایشاں از عمے

درمیان فرقے بود بے منتہا

—তাদের কথা—আমরা মানুষ নবীগণও মানুষ, তাঁরা আমরা একই নিয়মে আহার নিদ্রায় সমঅংশীদার। কিন্তু অজ্ঞতার দরুন দুইয়ের মাঝখানে সীমাহীন ব্যবধানের মর্ম তাদের বুঝে আসেনি। —ওয়ায—ঈওয়াউল ইয়াতামা, পৃষ্ঠা ২৬

৬১. আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে ইসলামের প্রতি বৈরী, এরূপ পাত্রের সাথে মুসলমান পাত্রীর বিয়ে বৈধ নয়।

পরিতাপের বিষয় হলো--এমন সব পাত্রের হাতে আজকাল কন্যা তুলে দেয়া হয় আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে যাদের কেউ কেউ লাগামহীন জীবনে অভ্যস্ত। এমনকি দীন ও ঈমানের সাথে তাদের কোন সম্পর্কই নেই। মুখে কুফরী কথা প্রকাশেও এরা দ্বিধা করে না। এহেন ছেলের কাছে মেয়ে বিয়ে দিয়ে আত্মীয়রা খুশি কত—"যাক একটি সুন্নাত তরীকা আদায় হলো।" কিন্তু তাদের কল্পনায়ও নেই যে, সুন্নত শুদ্ধ হওয়া না হওয়া ঈমানের ওপর নির্ভরশীল। অথচ পরিতাপের বিষয় হলো—দুলা মিয়া কতবার যে ঈমান থেকে খারিজ হয়েছেন তা একমাত্র আল্লাহ্ জানেন। এখন সে পূর্ব দৃষ্টান্ত বাস্তবায়িত হচ্ছে যে, কাপড়কে খণ্ড খণ্ড করে বরং পুড়িয়ে আচকান সেলাইয়ের বন্দোবস্ত হচ্ছে। এর আগে আমরা অশ্রুপাত করতাম এই দেখে যে, "আচকান প্রয়োজনের অনুপাতে সেলাই করা হচ্ছে না, এক হাত আধা হাত ছোট করা হচ্ছে।" আর এখানে তো পুরা হাতাই গায়েব, নিচের পাট্টার খবরই নেই। অথচ 'আচকান তৈরি হচ্ছে' রবে খুশির অন্ত নেই! একটি দীনদার মেয়ের জনৈক ইংরেজি শিক্ষিত ছেলের সাথে বিয়ে হয়। পাত্র একবার ভর মজলিসে মন্তব্য করতে থাকে ঃ "মুহাম্মদ সাহেব (সা) বাস্তবিকই একজন মহান সংস্কারক ছিলেন। তার সাথে আমার উত্তম সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু রিসালাত তো একটি ধর্মীয় কল্পনা মাত্র।" নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক, এটা একটা কুফরী বাক্য। এর দ্বারা বৈবাহিক সম্পর্কই তো ছিন্ন হয়ে যায়। একথা পাত্রীপক্ষকে বলা হলে তারা উল্টো মারমুখী হয়ে ওঠে এই বলে যে, এ উক্তি দ্বারা আমাদের বংশের নাক কাটা হয়েছে। আগেকার যুগে বিবেচনা করা হতো পাত্র চরিত্রবান কি-না। আর এখন দেখতে হয় পাত্র মুসলমান, না কাফের। উক্ত ঘটনা দ্বারা আমার এ উক্তি প্রমাণিত যে, "আমাদের আমল শুধু খারাপই নয় বরং বাতিল।" অথচ মজার ব্যাপার হলো আমরা একে কল্যাণকর মনে করে সওয়াবের আশায় বসে আছি। এ প্রসঙ্গে কবির বাক্য প্রণিধানযোগ্য। বলেছেন ঃ

وسوف ترى اذا انكشف الغبار

افرس تحت رجلك ام حمار

—আঁধারের আচ্ছাদন সরে গেলে অচিরেই তুমি দেখতে পাবে তোমার নিচের বাহনটি ঘোড়া কি গাধা। —ওয়ায—মুনাযা'আতুল হাওয়া, পৃষ্ঠা ৬৫

৬২. মহানবী (সা)-এর যুগে জন্মগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা অজ্ঞতাপ্রসূত।

মাওলানা থানভী (র) বলেন—মহানবী (সা)-এর সময়কালে জন্মগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা অনেকেই প্রকাশ করে। আমি বলি—নবীযুগে জন্ম না হয়ে এক হিসেবে আমাদের জন্য ভালই হয়েছে। কারণ, আমাদের অবস্থা বিচিত্র রং-এর—আল্লাহ্‌র পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে আমরা অতিশয় কুণ্ঠিত। অথচ নবীযুগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সব সময় লেগেই থাকত। কখনো হুকুম হতো যাকাত দাও, কখনো নির্দেশ আসত জিহাদে আত্মনিবেদনের, আবার কোন কোন সময় প্রশ্ন আসত আপনজনদের ছেড়ে যাওয়ার। তাই আমাদের ন্যায় এহেন স্বভাব-প্রকৃতির লোকদের পক্ষে নবীর হুকুম পালনে উদাসীনতা প্রদর্শনের ফলশ্রুতিতে নবুয়তের অস্বীকৃতি পর্যন্ত বিচিত্র ছিল না। পরিণামে কুফরী এবং ইহ ও পরকালীন ধ্বংস আমাদের জন্য অনিবার্য হয়ে পড়ত। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ জানেন আমাদের আচার-আচরণের সমসাময়িকতার অশুভ রূপ আত্মপ্রকাশ করত কি-না। এখন সুসংকলিত শরীয়ত আমরা পেয়ে গেছি। মহানবী (সা)-এর চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্ট্য,তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের সামনে উপস্থিত, বিনা বাধায় আমরা জানতে ও শুনতে পারি সেসব ঘটনার বিবরণ। ক্ষেত্র বিশেষে তাঁর সুন্নত ও আদর্শের পরিপন্থী কর্মকাণ্ডও আমাদের দ্বারা ঘটে যায়। আল্লাহ্ না করুন, তাঁর খেলাফ করলেও আমাদের প্রতি অহীর তিরস্কার ও সরাসরি নিন্দার অবকাশ নেই। তাঁর সময়কার লোকেরা জীবনের প্রথম থেকে সর্বক্ষণ তাঁকে লক্ষ করেছে। তিনি তাদের দেব-দেবীর নিন্দা করতেন। তাদের তাঁর সাথে আত্মীয়তা ছিল, সামাজিক ও গোত্রীয় বন্ধন ছিল। মহানবী (সা)-এর পক্ষ থেকে বহু বিষয় তাদের বিপক্ষে বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও তাঁরা রাসূল (সা)-এর আনুগত্যে ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। সুতরাং শ্রেষ্ঠত্ব ও বুযুর্গীর যোগ্য কে, তাঁরা না আমরা?

—মাকালাতে হিকমাত, দাওয়াতে আবদিয়ত, ৭ম খণ্ড

৬৩. লোকরা গাফুরুর রাহীম-এর অর্থ বুঝতে ভুল করেছে।

আল্লাহ্ গাফুরুর রাহীম, তওবা ইস্তিগফার করে নেব আর গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু পার্থিব লাভ অর্থাৎ গৃহ নির্মাণ বিনা ঘুষে সম্ভব নয়। ঘুষ ছাড়া তাৎক্ষণিক

উপকার অসম্ভব আর ক্ষতি দৃশ্যত অপূরণীয়। সুতরাং যে ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব তা স্বীকার করে ঘুষ নেয়া বাঞ্ছনীয়। অতঃপর আল্লাহ্‌র নিকট থেকে ক্ষমা করিয়ে নেব।

বন্ধুগণ! উপরোক্ত সংলাপ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, নফ্‌স অকল্যাণকে কিভাবে কল্যাণের ভঙ্গিতে, মঙ্গলের আকৃতিতে রঞ্জিত করে পেশ করে। কিন্তু শয়তানের এ সর্বনাশা শিক্ষার দৃষ্টান্ত সে প্রসিদ্ধ ঘটনায় প্রণিধানযোগ্য—একব্যক্তি তার তোতা পাখিকে دریں چہ شك 'এতে কি সন্দেহ' ফার্সী গদ শিখিয়েছিল। এখন প্রত্যেক প্রশ্নের জবাবে সে একই বুলি আওড়ায়। বস্তুত বাক্যটিও এমনি প্রকৃতির যে, অধিকাংশ প্রশ্নের জবার হতেও পারে। সুতরাং বেচার জন্য সে ব্যক্তি পাখিটি বাজারে নিয়ে দাবি করল—আমার তোতা ফার্সী কথা বলে। এক ব্যক্তি পরীক্ষামূলক কয়েকটি প্রশ্ন করে, জবাবে সে دریںچہ شك (এতে কি সন্দেহ) বুলিই আওড়িয়ে যায়। বলা বাহুল্য, প্রশ্নগুলি ছিল এমন ধরনের যার জবাবে উক্ত বাক্যের প্রয়োগ শুদ্ধ ছিল। প্রশ্নকারী খুশি হয়ে ক্রয় করে পাখীটি বাড়ি নিয়ে যায়। এখন এদিক সেদিকের যত কথাই সে জিজ্ঞেস করে পাখির জবাব একই 'দরী চে শক'। কথাটা ঐ ক্ষেত্রে খাটুক আর নাই খাটুক সে একই কথা বলতে থাকে। সে লোক এক পর্যায়ে বিরক্ত হয়ে বলল, দুঃখ—তোকে খরিদ করাটাই আমার বোকামি হয়েছে। এর জবাবেও তোতার একই কথা—'দরী চে শক'—এতে কি সন্দেহ। আমাদের নফ্‌সও তদ্রূপ একটি বুলি মুখস্থ করে সর্বত্র চালিয়ে দিচ্ছে—'আল্লাহ গাফুরুর রাহীম'। আল্লাহ্‌র হক কিংবা বান্দার হক গুনাহ যে জাতেরই হোক কথা তার একই। দ্বিতীয়ত, এ আহমকদের এ-ও জানা নেই যে, আল্লাহ্ গাফুরুর রাহীম হলেই পাপের সাজা না হওয়া কি করে অনিবার্য হয়? গাফুরুর রাহীম হওয়ার জন্য তাই যদি জরুরী হয়, তবে আল্লাহ্ পাক আখিরাতে যেরূপ গাফুর ও রাহীম, দুনিয়াতেও তো তিনি তাই। কেননা আল্লাহ্‌র সিফাত বা গুণ চিরন্তন। সুতরাং গাফুর ও রাহীম হওয়ার অর্থ যদি এই হয় যে, যা মনে চায় তাই কর—ক্ষতির কোন আশংকা নেই, তাহলে বিষ খেলে তার ক্রিয়া না হওয়া উচিত। অথচ তা অনিবার্যরূপে হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ গাফুর (ক্ষমাশীল) ও রাহীম (দয়ালু) হওয়াতে কোন ব্যাঘাত পড়ে না। তদ্রূপ আখিরাতেও তিনি গাফুর ও রাহীম হবেন আর গুনাহ্‌র সাজাও হবে। কারণ গাফুরুর রাহীম হওয়ার জন্য পাপের সাজা না হওয়া অনিবার্য নয়। আল্লাহ্ রাহীম তথা দয়ালু এ অর্থেও যে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন ঃ

ولا تقربوا الزنا এবং لا تقربوا الصلوة وانتم سكارى انه كان فاحشة

অর্থাৎ "বেহুঁশ অবস্থায় নামাযের নিকট যাবে না এবং যিনার ধারে-কাছেও ঘেঁষবে না, এসব বড় অশ্লীল কাজ।" এটা তার পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহ যে, তিনি স্বয়ং কল্যাণধর্মী বিধান রচনা করে সবার সামনে ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, কল্যাণ ও সন্তুষ্টির পথ এটাই। নতুবা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির রাস্তা জেনে নেয়ার দায়িত্ব মূলত ছিল আমাদের ওপর। অধিকন্তু মহান আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁর সন্তুষ্টির পথনির্দেশের সাথে জননিরাপত্তামূলক বিষয়ও শিখিয়েছেন। এছাড়া রহীম শব্দের আরো বহু অর্থ রয়েছে যা আমি পরে উল্লেখ করব। সাজা-শাস্তির পর মাফ করে দেয়াও ক্ষমার অর্থবোধক। প্রশ্ন হতে পারে—সাজার পর ক্ষমা এ দুয়ের সমাবেশ কেমন যেন অযৌক্তিক কথা এবং এদের মধ্যে পারস্পরিক বৈপরীত্যও বিদ্যমান। উত্তরে বলব—বন্ধুগণ ! আপনারা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব আর গুনাহ্‌র রহস্য কোনটাই যথার্থভাবে মূল্যায়ন করতে পারেননি। তাই শুনুন, গুনাহ্ বা পাপ বলা হয় প্রভুর অবাধ্যতাকে। অতঃপর প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্ব অনুসারে অপরাধের মাত্রা নির্ণিত হয়। যেমন জেলা প্রশাসকের হুকুম অমান্য করা অপরাধ ঠিকই কিন্তু বড়লাটের অবাধ্যতা তদপেক্ষা বড় অপরাধ। সম্রাটের হুকুম অমান্য তার চাইতেও মারাত্মক অপরাধ। অনুরূপ বড় ভাইয়ের হুকুম অমান্য করা অন্যায় কিন্তু পিতার অবাধ্যতা আরো বড় অন্যায়। মোট কথা, মালিক বা প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব অনুপাতে অপরাধের মাত্রা ধার্য হয়। আমার কথার একাংশ তো এই। দ্বিতীয় অংশ হলো—আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই এটা সর্বজনস্বীকৃত কথা। কারণ অন্যদের বড়ত্ব সীমিত আকারের অথচ আযমতে ইলাহী তথা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব অসীম, অকল্পনীয়। তৃতীয়ত, অপরাধ অনুপাতে সাজা হবে এটা সর্বজনস্বীকৃত। তাহলে এখন বুঝুন, আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেউ নেই। তাই তাঁর অবাধ্যতার চেয়ে বড় অবাধ্যতা আর কিছুই হতে পারে না। অতএব, তাঁর অবাধ্যতার সাজার অধিক সাজা অন্য কারো অবাধ্যতায় না হওয়াই যথার্থ। গায়রুল্লাহ্‌র বড়ত্ব যেহেতু সীমিত পর্যায়ের, কাজেই তার অবাধ্যতার সাজাও সীমিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ সীমাহীন শ্রেষ্ঠত্বের মালিক—অতএব, তাঁর অবাধ্যতার শাস্তি অসীম হওয়াই যুক্তিযুক্ত। সুতরাং এ যুক্তির দাবি হলো, নাফরমানী যেহেতু মহান আল্লাহ্‌র তাই কারো দ্বারা সগীরা বা ছোট গুনাহ্ সংঘটিত হলে তার সাজা ক্ষমাহীন চির জাহান্নাম হওয়াই ছিল যুক্তিসঙ্গত। অথচ কাফির-মুশরিক ব্যতীত অন্য কারো জন্য চির জাহান্নাম নির্ধারিত নয়। সুতরাং গুনাহর সাজা দশ হাজার কিংবা দশ লাখ বছর ভোগ করার পরও যদি মুক্তি পাওয়া যায়, তবে তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মাগফিরাত তথা ক্ষমা হিসেবে গণ্য হবে কি-না ? অবশ্য অবশ্যই এটা তাঁর ক্ষমা ও দয়া। দুনিয়ার

মামলা-মোকদ্দমার ঘটনা প্রবাহে আমরা প্রত্যহ লক্ষ করি—দশ বছর কারাযোগ্য অপরাধীকে দুবছর দণ্ডভোগের পর মুক্তি দেয়া হলে তা বিচারকের বিরাট দান ও অনুগ্রহ বলে গণ্য করা হয়। যদি তাই হয়, তবে আল্লাহ্ সীমাহীন, চিরন্তন আযাবের পরিবর্তে সাজার সময়সীমা সীমিত করে দশ হাজার বা দশ লাখ বছর পরও যদি মুক্তি দান করেন, এমতাবস্থায় অবশ্যই এটা তাঁর মাগফিরাতেরই পর্যায়ভুক্ত। বিষয়টা এতক্ষণে হয় তো আপনাদের নিকট পরিষ্কার হয়ে থাকবে যে, গাফুর তথা ক্ষমাশীল হওয়ার জন্য শাস্তিদানে বিরত থাকা অনিবার্য নয়। বরং নির্দিষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্ত সাজা ভোগের পর মুক্তি দেয়াও ক্ষমাশীল হওয়ার অর্থ প্রকাশ করে। এর অপর অর্থ এ-ও হতে পারে যে, পাপাচারের সাথে সাথেই পার্থিব জীবন-সীমায় প্রকাশমান তাৎক্ষণিক দণ্ড দান না করা। একে তাঁর রহমত বা দয়াও বলা যায়। রাহীমের দ্বিতীয় অর্থ শুনুন। এটা সবার জানা কথা যে, ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে কারামুক্তিই বড় কথা, তাকে পুরস্কার দেয়ার কোন নিয়ম নেই, এর হকদারও তাকে কেউ মনে করে না। তাহলে জাহান্নামের কারাগার থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে সুখে-দুঃখে যথা ইচ্ছা ঘুরে বেড়াক, বান্দাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া মহান আল্লাহ্‌র হক ছিল। কিন্তু তিনি রাহীম-দয়াবান তাঁর অনুগ্রহের চিরন্তন আকর্ষণে বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে ঠাঁই দিয়েছেন, যাতে এমন সব সুখের আয়োজন যা কখনো কেউ চোখে দেখেনি, কানে শোনেনি, এমনকি অন্তরে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

فيها مالا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

(অর্থাৎ জান্নাতে এমনি অফুরন্ত সুখের আয়োজন রয়েছে যা কোন চোখ দেখেনি, কান শুনেনি, এমনকি কোন মানব অন্তর কল্পনাও করতে সক্ষম নয়।

অতঃপর অপরাধ ক্ষমা করে বান্দাকে তিনি নৈকট্য দান করেন। কারো সাথে সপ্তাহে, কারো সাথে মাসিক আবার কারো সাথে বছরান্তে সাক্ষাতের ব্যবস্থা নির্ধারিত থাকবে। সকাল-সন্ধ্যা দৈনিক দু'বার সাক্ষাত লাভে ধন্য ব্যক্তিই হবে আল্লাহ্‌র সর্বাধিক প্রিয় বান্দা। অধিকন্তু আগন্তুকের প্রতি সালামের নির্দেশ ঘোষিত না হয়ে হাদীসের মর্ম অনুযায়ী বরং সকল মানুষকে জান্নাতের বাগানে একত্র করে স্বয়ং নূরে ইলাহী বিকশিত হবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে কালামে রাব্বানী উচ্চারিত হবে السلام عليكم (তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)। সুতরাং সাধ্য থাকে তো কেউ অপরাধীর সাথে এ ধরনের অনুগ্রহভরা আচরণের নযীর উপস্থাপন করুক। অতএব আপনাদের লক্ষ করার মত ব্যাপার হলো—আল্লাহ কি পরিমাণ অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য

বান্দাদের প্রতি স্বয়ং সালাম পাঠাবেন, অতঃপর তাদেরকে নিজের প্রতি আহবানের পরিবর্তে নিজেই আগমন করে নূরের তাজাল্লীন বিকশিত করবেন। একবাক্যে সবার কণ্ঠে তখন উচ্চারিত হবে ঃ

امروز شاه شهان مهمان شدست مارا

—শাহানশাহ-রাজাধিরাজ এখন আমাদের মেহমান।

তাই রহমতের অর্থ আপনাদের পরিষ্কার হওয়া স্বাভাবিক। এ ব্যাখ্যা দ্বারা আপনাদের উপলব্ধি হলো অনুগ্রহের জন্য জরুরী নয় যে, অপরাধের সাজাই না হোক। এ জাতীয় মানসিকতা নফসের প্রবঞ্চনা ভিন্ন কিছুই নয়। একেই বলা হয়— كلمة حق اريد بها الباطل —অর্থাৎ সত্য ভাষণের অসৎ উদ্দেশ্য। তাই আমি বলি—মানব প্রবৃত্তি বা নফ্স কল্যাণের আবরণে অকল্যাণ ডেকে আনে।

—ওয়ায—ওয়াহদাতুল হুব্ব, ৫ম পৃ., দাওয়াতে আবদিয়াত, ৮ম খণ্ড

৬৪. মূর্খ ওয়ায়েযদের বিভ্রান্তিকর ওয়ায।

ইল্মহীন মূর্খ ব্যক্তির ওয়ায করা অনুচিত। এতে কয়েক প্রকার বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। প্রথমত এটা হাদীসের পরিপন্থী। কেননা যেকোন কাজ যোগ্য ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত করা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ। তিনি বলেছেন ঃ

اذا وصل الامر الى غير اهله فانتظر الساعة

অর্থাৎ অযোগ্য ব্যক্তির ওপর কার্যভার ন্যস্ত হওয়া শুরু হলে কিয়ামতের অপেক্ষা কর। বোঝা গেল অযোগ্য লোকের হাতে দায়িত্ব অর্পণ এত গুরুতর অন্যায় যে, এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হওয়া কিয়ামতের নিদর্শন। সুতরাং ব্যক্তির আওতাধীন যে কাজ কিয়ামতের আলামতভুক্ত তা গুনাহ্ ও নিন্দনীয়। বলা বাহুল্য, মূর্খ জাহেল ওয়ায করার যোগ্য নয়। এ কাজ যোগ্য ও বিজ্ঞ আলিমগণের। কাজেই অ-আলিমকে এ কাজের অনুমতি দেয়া মোটেই সমীচীন নয়। দ্বিতীয়ত, এর ফলে অনেক সময় কোন মাসআলায় অজ্ঞতার দরুন এমন সব ভুল-ভ্রান্তি আনাড়ি লোক দ্বারা ঘটে যায়, যা সে ধারণাই করতে পারে না। কেউ হয় তো সতর্ক থাকে। কিন্তু নিজ জ্ঞানের পরিধি অনুপাতেই তো মানুষ হুঁশিয়ার থাকতে পারে ? আর অপরিপক্ব জ্ঞানের দরুন ভুলের সম্ভাবনা লেগেই থাকে। উপরন্তু এহেন ব্যক্তির ওয়ায শুনে সাধারণ লোকেরা আলিম মনে করে মাসআলা-মাসায়েল তার কাছে জানতে চাইবে। কিন্তু আজকাল এমন লোক কোথায় পাওয়া যাবে, যে নিসংকোচে প্রকাশ করবে—আমি আলিম নই,

মাসআলা আমার জানা নেই। অবশ্যই বানিয়ে চড়িয়ে জবাব দেবে আর অধিকাংশই হবে ভুল-ভ্রান্তি ভরা। আর অস্পষ্ট জবাব দ্বারা যদিও সে ভ্রান্তি থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে তাতেও জনগণের বিভ্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে প্রবল। কোন কোন জাহেল অজ্ঞাত মাসআলার এমন চাতুর্যপূর্ণ জবাব দেয় যা দ্বারা সঠিক জবাবও জানা যায় না এবং তার অজ্ঞতাও ধরা পড়ে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গাংগুহতে জনৈক মূর্খ লোক ফতোয়া দিয়ে বেড়াত। মাওলানা গাংগুহী (র)-এর তখন যৌবন বয়স। পরীক্ষামূলকভাবে তাকে তিনি প্রশ্ন করেন ঃ গর্ভাবস্থায় স্বামীহারা রমণীকে বিয়ে করা কেমন ? সে উত্তর দিল ঃ "যেমন ঘেরাও দেয়া।" এহেন চাতুর্যপূর্ণ অস্পষ্ট জবাব দ্বারা না তার মূর্খতা প্রকাশ পেল, আর না বৈধতার ফতোয়া হলো। কিন্তু সাধারণ লোকরা এর দ্বারা কি বুঝবে ? নিশ্চয়ই ভ্রান্তিতে পতিত হবে। কোন মূর্খ ওয়ায়েয সম্ভবত বলবে—আজকাল উর্দূ ভাষায় মাসআলার যথেষ্ট কিতাব রয়েছে, তাই দেখে আমরা ফতোয়া দেব। জবাবে আমার কথা হলো—কোন কোন মাসআলা একাধিক অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। এক অধ্যায়ে তা শর্তহীন বর্ণিত হয়েছে, অপর অধ্যায়ে শর্তযুক্তভাবে। অধিকন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে সেসব শর্ত এত সূক্ষ্মভাবে বর্ণিত যে, জাহেল তো দূরের কথা অভিজ্ঞ আলিমের দৃষ্টি পর্যন্ত ততদূর গড়ায় না। এর ফলে কোন সময় মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং কোন কোন অবিজ্ঞ, অদূরদর্শী মৌলভী ওয়াযের মধ্যে বলে থাকে—আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রিয্কের ওয়াদা রয়েছে কিন্তু মুসলমানরা এর ওপর ভরসা না করে ঘাবড়ে যায়। এ ব্যাপক বিষয়টির আলোচনাপর্বে মানুষের ঈমানের দুর্বলতার একচেটিয়া হুকুম জারি করে ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন—কোন মানুষ দাওয়াত দিলে তার ওপর পূর্ণ ভরসা রেখে সে বেলার খোরাক সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যায় অথচ আল্লাহ্র ওয়াদার প্রতি লোকদের আস্থা নেই। অতএব সে অবিজ্ঞ মৌলভীর উত্তমরূপে জানা উচিত যে, এটা ঈমানের দুর্বলতা নয় বরং মানসিক দুর্বলতা। বস্তুত ঈমানের দুর্বলতা এক জিনিস আর মানসিক দুর্বলতা ভিন্ন জিনিস। আল্লাহ্র ওয়াদায় বিশ্বাস রাখে না এমন কোন মুসলমান থাকতে পারে না। ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে বর্ণিত দৃষ্টান্ত নিতান্ত ভুল এবং আল্লাহ্র ওয়াদাকে মানুষের ওয়াদার সাথে তুলনা করাও ঠিক নয়। কারণ দাওয়াতকারী ব্যক্তি নির্ধারণ করেছেন যে, আমার ঘরে অমুক বেলার দাওয়াত। যদ্দ্বারা নিশ্চিতরূপে জানা গেল যে, সে বেলা আমার খাওয়ার ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছে। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এরূপ নির্দিষ্ট ওয়াদা পাওয়া গেলে মানুষের ওয়াদা অপেক্ষা তাঁর ওয়াদার প্রতি মুসলমানদের ভরসা অত্যধিক প্রবল হতো। কিন্তু আল্লাহ্র ওয়াদা এরূপ নির্দিষ্ট নয় যে, দুই বেলাই

দেব, এক পোয়া পরিমাণ দেব এবং বন্ধ করা হবে না। বরং আল্লাহ্‌র তরফ থেকে দেয়া হয়েছে অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট ওয়াদা যে, "আমি রিয্‌ক দেব।" এর অবস্থা ও পরিমাণ নির্দেশ করা হয়নি। সম্ভবত তৃতীয় দিন পাওয়া যেতে পারে।

মোটকথা, আল্লাহ্‌র ওয়াদায় অস্পষ্টতা বিদ্যমান অথচ বান্দার ওয়াদা সন্ধ্যাবেলার নির্দিষ্ট সময়ে। সুতরাং মনের এ বিচলিত ভাব ঈমানী দুর্বলতাভিত্তিক নয়; বরং এর অবস্থা ও পরিমাণ জানা না থাকার দরুন। যার কারণ হলো—নিছক মানসিক দুর্বলতা। দাওয়াতকারীর ওয়াদাও এ ধরনের হলে এর চাইতে অধিক বিচলিত হওয়া বিচিত্র ছিল না। অতএব কত বড় অন্যায় কথা যে, অভিযোগকারীরা ঈমানী দুর্বলতার অভিযোগই দাঁড় করিয়েছে।

—ওয়ায—শাবান, ১৪৮ পৃ., দাওয়াতে আবদিয়াত, ৮ম খণ্ড

প্রসঙ্গত আরেকটি উদাহরণ এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। যেমন—এক জাতীয় দু'টি বস্তু পারস্পরিক কম-বেশির ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নয়। যথা—রূপার বিনিময়ে রূপা, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ খরিদকালে উভয়দিকে সমান সমান হওয়া অনিবার্য, কম-বেশির তারতম্য হারাম। এখন মূর্খরা মাসআলা এভাবেই বর্ণনা করবে। সময়ে এমনও হতে পারে যে, রূপার দাম সমান না হয়ে বরং দশ আনা তোলা বিক্রি হবে। এমতাবস্থায় এক টাকার বিনিময়ে টাকার ওজন অপেক্ষা অধিক রূপা পাওয়া যাবে। অথচ তাদের কেবল এতটুকু মাসআলাই জানা আছে যে, এক জাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে তারতম্য হারাম। এমতাবস্থায় নিজেরাই হয় তো টাকার সমপরিমাণ রূপাই কিনে আনবে আর আত্মীয়দের সামনে বোকা সাজবে অথবা অপরকে এতে বাধ্য করবে। উভয় অবস্থায় শরীয়তের প্রতি কলংক আরোপের কারণ ঘটাবে যে, মাসআলা তো বেশ খাসা যে, একটা জিনিস টাকার বিনিময়ে টাকার ওজন অপেক্ষা পরিমাণ বেশি পাওয়া যায় কিন্তু শরীয়ত বলছে বেশি নেয়া চলবে না, সমান নিতে হবে। তাহলে এ সমস্যা সৃষ্টি হল মূর্খতার দরুন। কোন বিজ্ঞ আলিম এ মাসআলা বর্ণনার সাথে সাথে এ কথাও বলে দিবে যে, এক টাকার বিনিময়ে রূপা যদি ওজনে টাকা অপেক্ষা পরিমাণে বেশি পাওয়া যায়, তবে টাকার বিনিময়ে রূপা কিনবে না, বরং টাকা ভাঙ্গিয়ে সিকি-দোআনী এবং কিছু পয়সা এর সাথে মিলিয়ে তবে খরিদ করবে।

এখন এক টাকার বিনিময়ে জায়েয পন্থায় এক তোলার অধিক রূপা নিয়ে আসবে। কারণ রিজগারী জড়িত চান্দীর বিপরীত সমপরিমাণ চান্দী হল, বাকী চান্দী পয়সার বিনিময়ে গণ্য হবে। চান্দী আর পয়সার মধ্যে 'জিন্‌স্' তথা জাতের

বিভিন্নতার কারণে কম-বেশির তারতম্য জায়েয। এটা ছিল মানুষকে অসুবিধায় ফেলা না ফেলার উদাহরণ। এবার শর্ত আর শর্তমুক্তের দৃষ্টান্ত শুনুন। যেমন ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ اختیاری শব্দটিকে "কিনায়া তালাক" অধ্যায়ে বর্ণনা করত এর হুকুমে বলেছেন—এক্ষেত্রে তালাক হওয়া না হওয়া নিয়তের উপর নির্ভরশীল। এ দ্বারা দৃশ্যত প্রতীয়মান হয় যে, اختیاری শব্দের অন্তরালে তালাকের নিয়ত বিদ্যমান থাকা মাত্রই তালাক পড়ে যাবে যেকোন ক্ষেত্রে। কিন্তু "তালাকে তাফ্‌বীয" অধ্যায়ে বর্ণিত একই اختیاری শব্দ দ্বারা তালাক হওয়ার আরো একটি শর্ত রয়েছে। তাহলো—তাফবীযের ক্ষেত্রে اختیاری শব্দ উচ্চারণ দ্বারা নিয়ত থাকা সত্ত্বেও তালাক হবে না যদি না স্ত্রী এখানে একই মজলিসে তালাক কবূল করে। অর্থাৎ, স্ত্রীর কবূলের শর্তে এখানে তালাক হবে। ফকীহ্‌গণ বিবাহিতা স্ত্রীর ইখতিয়ারের শর্ত 'কিনায়া' অধ্যায়ে নয়; বরং 'তাফবীয' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং 'তাফবীয' অধ্যায় অধ্যয়ন ছাড়াই কেবল 'কিনায়া' অধ্যায়ে اختیاری শব্দ দেখা মাত্র স্বামীর নিয়তের উপর ভিত্তি করে কারো পক্ষে তালাকের ফতোয়া চালিয়ে দেয়া নিতান্ত ভুল সিদ্ধান্ত। এক্ষেত্রে কোন কোন আলিম পর্যন্ত ভুল করে ফেলেছেন। আল্লামা শামী উক্ত মাসআলায় ভুল ফতোয়া দানকারী জনৈক ফিকাহ্‌বিদের ত্রুটি নির্দেশও করেছেন। তদুপরি কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও হয়—এক মাসআলা এক কিতাবে শর্তহীন, অন্য কিতাবে শর্তযুক্ত বর্ণিত থাকে। কাজেই ফিকার মাসআলাতে শুধু এক কিতাব পড়ে নয়, বরং এ সম্পর্কিত বিভিন্ন কিতাব দেখে শুনে ফতোয়া দেয়া মুফতীর জন্য বিশেষ জরুরী। মোট কথা, ফিকাহ এক জটিল ও সূক্ষ্মতম বিষয়। অনভিজ্ঞ মূর্খ ওয়ায়েয অবশ্যই এতে ভুল করে বসবে। বিষয়টা পরীক্ষা করার সহজ উপায় হলো—কোন জাহেল ওয়াযকারীর ওয়াযের সময় কোন আলিমকে পর্দার আড়ালে দু-চারবার বসিয়ে রাখুন। 'দু-চারবারের' কথা এ জন্য যে, একবারের ভুল থেকে সে সম্ভবত বেঁচেও যেতে পারে কিন্তু প্রত্যেকবার জান বাঁচানো মূর্খের পক্ষে কঠিন। অতঃপর আলিম সাহেবকে জিজ্ঞেস করুন কত ভুল যে সে করেছে। ইনশাআল্লাহ এভাবে আশা করি তার স্বরূপ ধরা পড়বেই। তাই আমি বলি—এ কাজ অযোগ্য ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা অনুচিত। অবশ্য আলিমের ভুল হয় না এরূপ দাবি আমি করি না। তিনিও মানুষ, ভুল-ত্রুটি তাঁর পক্ষেও অসম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর ভুলের পরিমাণ হবে অল্প এবং সাধারণ পর্যায়ের। মারাত্মক ধরনের এবং অধিক পরিমাণে ভ্রান্তি থেকে নিরাপদ থাকা আলিমের পক্ষেই স্বাভাবিক। হয় তো তিনি শতকরা দু-একবার ভুল করতে পারেন কিন্তু জাহেলের ওয়াযে ভুল হবে পদে পদে। অধিকন্তু আলিমের পক্ষে সংশোধন করত অন্য কোন

ওয়াযে শুধরে দেয়াও সম্ভব। কিন্তু জাহেল ব্যক্তির আপন ভুলের অনুভূতিই থাকে না, শোধরানো তো দূরের আশা। অতএব জাহেলের অবস্থা বড় মারাত্মক, বড় ভয়াবহ। একথা উত্তমরূপে বুঝে নিন।

জনাব, আপনাদের অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু আমার আছে বলেই বলি—অযোগ্য ব্যক্তিকে ওয়াযের অনুমতি ও সুযোগ না দেয়া উচিত। আল্লাহ্‌র কসম! মূর্খতার অশুভ পরিণাম সমাজ দেহে আজ ব্যাপক হারে ছড়িয়ে যাচ্ছে। কানপুরের ঘটনা, সেখানকার এক ব্যক্তি সর্বাঙ্গদোষী একটি খাসী কুরবানী দেয়। লোকজন বলল—মিয়া এ ধরনের কুরবানী তো জায়েয নয়। সে বলল—বাহ্‌, আমার বিবি সাহেবা যে ফতোয়া দিয়েছেন জায়েয। অতঃপর সে স্ত্রীকে যেয়ে বলল—মানুষ তোমার ফতোয়া ভুল বলে। স্ত্রীর "শরহে বেকায়া'র উর্দূ তরজমা পড়া ছিল, তাই কিতাবখানা বাইরে পাঠিয়ে বলল—দেখুন, এতে লিখা রয়েছে কোন অংগ এক তৃতীয়াংশের কম কাটা থাকলে সে জন্তুর কুরবানী জায়েয। আর আমার খাসীর কোন অংগই এক তৃতীয়াংশের বেশি কাটা নয়, বরং কমই। যদিও সমষ্টিগতভাবে বেশিই ছিল। এ অযৌক্তিক কাণ্ডের কোন ঠাঁয়-ঠিকানা আছে কি ? শরহে বেকায়ার অনুবাদ পড়েই মেয়ে মানুষ মুফতী হয়ে গেছে। —ওয়ায—আল হুদা ওয়াল মাগফিরাত, পৃ. ৪০

৬৫. দীনের প্রত্যেক কাজে জনসাধারণের দলীল তালাশ করা নিতান্ত ভুল।

মাওলানা থানভী (র) বলেছেনঃ ভক্তি-বিশ্বাসের উপর যাবতীয় কাজ-কারবার নির্ভরশীল। লক্ষ্য করুন, বাবুর্চি খানা পাক করে সামনে হাজির করে। আর সেই খানা শুধু তার প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিতে খেয়ে নেয়া হয়। অথচ খাদ্যে বিষ মিশানোর সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া চলে না। অনেক সময় এরূপ ঘটেও। অথচ সর্বক্ষেত্রে এর কোন আশংকাই করা হয় না। একইভাবে কর্মচারীর প্রতি বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে বণিক সম্প্রদায়ের কোটি কোটি টাকার কারবার চালু রয়েছে। অথচ কোন কোন সময় কর্মচারীরা বহু মাল আত্মসাৎও করে ফেলে। তদ্রুপ কর্মচারী দ্বারাই রাজার রাজত্ব চলে। দীনের যাবতীয় কার্যকলাপও তদ্রূপ ভক্তি-আস্থার মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়। যেমন—কুরআন শরীফকে কুরআনরূপে স্বীকার করা আলিমের প্রতি বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। বর্তমানের আলিমদের বিশ্বাস পূর্ববর্তী আলিমগণের উপর, তাঁদের আস্থা সাহাবা কিরামের উপর। আর সাহাবীগণ আস্থা রেখেছেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর। সুতরাং প্রমাণ হল—দীনী হোক কিংবা দুনিয়াবী যাবতীয় কার্যকলাপ ভক্তি-বিশ্বাস এবং পূর্ণ আস্থার ভিত্তিতে সম্পাদনশীল। অতএব প্রত্যেক দীনী বিষয়ে জনসাধারণের

প্রমাণ তালাশ করা ভুল।

—মাকালাতে হিকমত, ১নং, দাওয়াতে আবদিয়ত, ৮ম খণ্ড

৬৬. "আমলের ভিত্তিতে নয় মহানবী (সা)-এর জান্নাতে প্রবেশ হবে রহমতের ভিত্তিতে" এর উপর সন্দেহের জবাব।

"রাসূলুল্লাহ (সা) আমল দ্বারা জান্নাতে যাবেন না" একথা শুনে কারো এরূপ মনে করা সমীচীন নয় যে, তাঁর আমলে ত্রুটি ছিল। বস্তুত ব্যাপার হল—আমল দ্বারা জান্নাত লাভ করা উচ্চমানের নয়; বরং রহমতের অসীলায় জান্নাতে প্রবেশ মূলত মানগত দিক থেকে সর্বোচ্চ স্তরের! কারণ "ফলাফল কারণের অধীন"—এ মূলনীতির প্রেক্ষিতে অসম্পূর্ণ উপায়ের প্রতিফল অপূর্ণ আর সম্পূর্ণ কারণের পূর্ণাঙ্গ ফল পাওয়া বিধান সম্মত কথা। এ-হল বিষয়ের একাংশ। দ্বিতীয় অংশ হল—আল্লাহর রহমতের যে যত অংশই লাভ করুক তা সীমাহীনই হবে। অন্তহীনের অর্ধাংশও অসীম। আল্লাহ্‌র রহমত অবিভাজ্য, কিন্তু কোনও পর্যায়ে এর কাল্পনিক বিভক্তি মেনে নিলেও তার অসীমত্ব বিনষ্ট হবার নয়। কেননা অংশের সসীমতা স্বীকৃতির দরুন সমষ্টির সসীমতা অনিবার্য হয়ে পড়ে। অধিকন্তু এ স্বীকৃত বিধান যে, সসীম সমন্বিত সংযোজনের প্রতিফল সীমিত ও গণ্ডিভুক্ত হয়ে থাকে। অতএব অসীমের অর্ধাংশও অন্তহীন। ইতিপূর্বে ভূমিকার প্রথম পর্বে আমি বলেছি যে, ফলাফল কারণের অধীন। অর্থাৎ, কারণ অসম্পূর্ণ হলে ফলও তাই, আর পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় ফল হবে পরিপূর্ণ।

অতএব রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জান্নাতী মর্যাদা আমলের ভিত্তিতে নির্ণীত হওয়া অবস্থায় সীমিত হওয়াই স্বাভাবিক, যেহেতু আমল এক সীমাবদ্ধ বিষয়। পক্ষান্তরে রহমতের ভিত্তিতে হলে রহমত যেহেতু অসীম, কাজেই তাঁর মর্যাদাও হবে অসীম-অনন্ত। কাজেই রহমতের ভিত্তিতে যাওয়াটাই তাঁর পক্ষে অধিকতর মর্যাদা ও সম্মানের বিষয়।

মোট কথা, তাঁর আমল সসীম বটে, কিন্তু আল্লাহ না করুন, ত্রুটিপূর্ণ নয়। সুতরাং মহানবী (সা)-এর জান্নাত প্রবেশ আমলভিত্তিক না হওয়ায় তাঁর আমলে ত্রুটি থাকা আদৌ অনিবার্য হয় না। উত্তমরূপে বুঝুন, কারো আমল মহানবী (সা)-এর আমল অপেক্ষা উন্নত অথবা সমকক্ষ হওয়া অসম্ভব। তাঁর প্রত্যেক আমল সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও পরিপূর্ণ। কিন্তু আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের ভিত্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করা যেহেতু সর্বোচ্চ মর্যাদার, তাই আমলকে এর কারণ ও ভিত্তি নির্ধারিত করা হয় নি। উপরন্তু আমল যে প্রকার, যে মানেরই হোক, এর কারণ বা উপলক্ষ হবেই বা কিরূপে ?

কেননা অবশেষে পরিপূর্ণতাও আল্লাহ্‌র রহমতের আশ্রয়েই অর্জিত হয়। অতএব আমলের পূর্ণতা যেহেতু খোদাই রহমতেরই ফলশ্রুতি, তাহলে বান্দার কৃতিত্ব কি হল, যার ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সুতরাং আমলের গর্ব করার কারো অধিকার থাকতে পারেনা। লক্ষ্য করুন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মর্যাদা কত উচ্চ, তা সত্ত্বেও তিনি বলেন ঃ আমি পর্যন্ত আমলের আশ্রয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব না। তাহলে আমাদের তো কোন কথাই নেই। —ওয়ায-আল-হায়াত, পৃষ্ঠা ১৮

৬৭. হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক জবাইকালে হযরত ইসমাইল (আ)-এর অভিমত চাওয়া সম্পর্কিত সন্দেহের জবাব।

কারো কারো ধারণা মতে জানার উদ্দেশ্যে ইবরাহীম (আ) কর্তৃক "তোমার রায় কি" জিজ্ঞাসিত হয়ে ইসমাঈল (আ) বললেন ঃ يا ابت افعل ما تؤمر অর্থাৎ, হে পিতা! আপনি তা-ই করুন যা আপনার প্রতি হুকুম হয়েছে। এ দ্বারা তাদের মনে ইবরাহীম (আ)-এর অন্তরে বিচলিত ভাব সৃষ্টি হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি হয়। নাউযুবিলাহ! কবি বলেন ঃ

کار پاکاں را قیاس از خود مگیر

گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر

অর্থাৎ পুণ্যাত্মাগণের কার্যকলাপ নিজের সাথে তুলনা করো না, আসল ব্যাপার লিখন পদ্ধতির شیر ও شیر (শের ও শীর—সিংহ ও দুধ) লেখার ন্যায় যদিও তা সমআকৃতির। প্রকৃত অবস্থা হলো—ইবরাহীম (আ)-এর অন্তরে বিচলিত ভাব আদৌ ছিল না। আম্বিয়াগণের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটনা অকল্পনীয়। কোন কোন যাহিরপন্থীর মতে ইবরাহীম (আ)-এর মানসিকতায় বিচলিতভাব ছিল না সত্য, কিন্তু সে সময় পিতা অপেক্ষা পুত্রের মনোবল অধিকতর সুসংহত ও সুদৃঢ় ছিল যা তাঁদের ماذا ترى (বল তোমার কি মত) এবং افعل ما تؤمر (নির্দেশিত কাজ আপনি সম্পাদন করুন) পারস্পরিক প্রশ্নোত্তর দ্বারা প্রকাশ পায়। এরপর এ-ব্যবধানের তত্ত্বমূলক এক জনপ্রিয় আলোচনার তারা প্রয়াস চালায়, যা ইবরাহীম (আ)-এর নিন্দাজ্ঞাপক সুস্পষ্ট সমালোচনার ইঙ্গিতবাহী। এ প্রসঙ্গে তারা বলে—"নূরে মুহাম্মদী (সা) প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দেহে ছিল, যার অবদানে তিনি এমনি সুদৃঢ় মনোবলের অধিকারী ছিলেন যে, নমরূদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও উদ্বিগ্ন-উৎকণ্ঠিত হন নি। কিন্তু পুত্র ইসমাঈল (আ)-এর জন্মের পর সে নূর পুত্র দেহে স্থানান্তরিত হয় এবং এরি

ফলে তিনি [ইসমাঈল (আ)] এহেন চূড়ান্ত পর্যায়ের মনোবলের অধিকারী হয়ে ওঠেন।"

এই হল তাদের এ সম্পর্কিত তত্ত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ। কিন্তু এ ব্যাখ্যা শুনে আমার শরীরের পশম পর্যন্ত শিউরে ওঠে যে, মর্যাদাবান এহেন সম্মানিত পয়গাম্বরের শানে অশোভন উক্তি আর বেআদবীরও একটা সীমা থাকা উচিত। ছুঁড়ে ফেলুন এসব অপব্যাখ্যা, আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করুন যতসব প্রলাপোক্তি। কবির কল্পনা এ-ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য ঃ

زعشق نا تمام ما جمال یار مسغنی است

باب ورنگ وخال وخط چه حاجت روئے زیبارا

—বন্ধুর অনুপম রূপ-লাবণ্য আমাদের অসম্পূর্ণ-পঙ্গু প্রেমের মুখাপেক্ষী নয়, বস্তুত সুন্দর মুখের জন্য বর্ণ ও আকার-আকৃতির প্রয়োজন পড়ে না।

মূলত নূরে মুহাম্মদী স্থানান্তরিত হওয়ার ফলশ্রুতিতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আবিষ্কার করা মুখরোচক গল্প আর অলীক কাহিনী বৈ কিছুই নয়। লক্ষ করলে এর দ্বারা মহানবী (সা)-এর শানেও বে-আদবী প্রমাণ হয়। কেননা তাঁর নূর এত ক্ষণস্থায়ী নয়, যার উষ্ণ প্রভাব শীতল হতে পারে। তন্দুর চুলায় আগুন জ্বালালে তার তাপেও ঘণ্টাখানেকের মত চুলা উত্তপ্ত থাকে। তাহলে নূরে মুহাম্মদী কি এতই শীতলধর্মী যে, স্থানান্তরের পরই তার উত্তাপ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে ? অধিকন্তু এ উত্তাপ চিরদিনের জন্য স্থিতিশীল হওয়ার যোগ্য নয় কি ?

সুতরাং কল্পকাহিনী প্রসূত এ পার্থক্য স্বীকার করার কোন প্রয়োজনই পড়ে না। এবার আসুন তাহলে প্রকৃত বিষয়টা আলোচনা করা যাক। মূলত এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হল—হযরত ইবরাহীম (আ) ইসমাঈল (আ)-এর দয়ালু পিতাই কেবল ছিলেন না, সাথে সাথে রূহানী শায়খও ছিলেন। তাই আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক হিসেবে ইসমাঈল (আ)-এর দৃঢ়তার পরীক্ষা নেয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। এজন্যই তিনি বলেছেন ঃ فانظر ماذا ترى "চিন্তা করে দেখ তোমার রায় কি ?" কিন্তু এ পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন। জবাবে বললেন ঃ

يَاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ –

—হে পিতা, আপনি কার্যকর করুন যা আপনাকে হুকুম করা হয়েছে, আমাকে আল্লাহ চাহেতো আপনি ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।

তাঁদের মা'রিফাত ও অধ্যাত্মজ্ঞান-গভীরতার কি কোন সীমা আছে ? কতবড় কঠোর তাওয়াক্কুল যে, আপন শক্তি উপেক্ষা করে এখানেও বলছেন—"ইনশা আল্লাহ্"; উদ্দেশ্য—যদি আল্লাহ্‌র দরবারে কবূল হয়। এরি নাম কামাল বা পূর্ণতা। এহেন পুত্র সম্পর্কে বলা হয় ঃ

شا باش آں صدف كه چناں پرور د گهر

ابا از ومكرم وابنا عزيز تر

—ধন্য সে ঝিনুক যার মাঝে এহেন মুক্তা লালিত হয় যে, পিতা তার কারণে সম্মানিত আর পুত্ররা মর্যাদাশীল।

এই ছিল এ বিষয়ের মূল তত্ত্ব। যাহোক, ইসমাঈল (আ) সম্মতি জ্ঞাপনের পর ইবরাহীম (আ) জবাই করার উদ্দেশ্যে ছুরি হাতে নিয়ে তাকে মাটিতে শুইয়ে দেন। বস্তুত ইসমাঈল (আ)-এর এ দৃঢ়তা কামালিয়াতের ক্ষেত্রে ইবরাহীম (আ) অপেক্ষা অধিক নয়। বরং ইবরাহীম (আ)-এর কামালিয়াতই শ্রেষ্ঠ। কেননা অনেককেই আত্মহত্যা করতে শোনা যায় কিংবা দেখা যায়। কিন্তু সন্তান কুরবানীর ঘটনা অশ্রুতপূর্ব। পুত্রের গলায় ছুরি চালানো পিতার পক্ষে অসম্ভব। এখন বলুন, কার দৃঢ়তা অধিক। অতএব লক্ষণীয়, فانظر ماذا ترى-এর ন্যায় দ্ব্যর্থবোধক বাক্য দ্বারা ইবরাহীম (রা)-এর দৃঢ়তার আপেক্ষিক স্বল্পতা প্রমাণের প্রয়াস কত বড় ভুল চিন্তা। নূরে মুহাম্মদী বিচ্ছিন্ন হওয়ার দরুন যদি তিনি উৎকণ্ঠচিত্ত হয়ে থাকবেন তাহলে ছুরি চালনাকালে দৃঢ়চিত্ত হলেন কি করে ? অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নূর মুবারকের বরকত এত অসীম যে, ইবরাহীম (আ)-এর দেহ থেকে বিচ্ছিন্নতার পরও তা পূর্বের মতই নূর বিকিরণ করছিল। পার্থিব জগত অতিক্রমের পরও এখানে যেরূপ কিরণ ছড়িয়ে যাচ্ছে, তা আপনারা হামেশা প্রত্যক্ষ করছেন।

—রূহুল আজ্জ ওয়াস্‌সাজ্জ, পৃষ্ঠা ১৮

৬৮. পীর ধরার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ভ্রান্ত মাপকাঠি।

মহান আল্লাহ্ কর্তৃক اتبع سبيل من ناب الى (সে ব্যক্তির পথ অনুসরণ কর যে আমার প্রতি আকৃষ্ট) আয়াতের মাধ্যমে সেসব লোকের সংশোধন করা হয়েছে যারা বুযুর্গ লোকদের অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভবই করে না। এ দ্বারা ইত্তেবা তথা অনুসরণের গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। আর سبيل من اناب (খোদাভীরুদের পথ) দ্বারা সে দলের সংশোধন উদ্দেশ্য যারা যে কোন ব্যক্তির ভক্ত হতে আগ্রহী, কিন্তু ইত্তেবার

(অনুসরণ) নির্ভুল মাপকাঠি তাদের জানা নেই। এভাবে আল্লাহ তাদের বিশুদ্ধ মাপকাঠি নির্দেশ করেছেন। নতুবা মাপকাঠির তো আজকাল অভাব নেই। যেমন—কারো মাপকাঠি কাশ্‌ফ-কারামত; তাদের দৃষ্টিতে কাশ্‌ফের অধিকারী ব্যক্তিমাত্রই অনুসরণযোগ্য। কেউ বানিয়েছে কারামাতকে, কেউ 'ওজদ' ও 'সামাকে' আবার কারো মতে 'হারারাত' তথা উষ্ণ আবেগ যার মধ্যে তীব্রভাবে বিদ্যমান, যে ব্যক্তি অধিক ক্রন্দনে অভ্যস্ত, বুযুর্গ সেই লোক। কারো মাপকাঠি 'তাসাররুফাত' তথা একদৃষ্টিতে বেহুঁশ করতে যে সক্ষম সেই লোক বুযুর্গ অতি বড়। কারো মাপকাঠি নিঃসঙ্গতা, বিশেষ পরিস্থিতিতে এর অনুমতি যদিও স্বীকৃত কিন্তু এটা মাপকাঠি নয়। কারো মতে বুযুর্গীর মাপকাঠি কঠোরতা। কাজেই যে লোক ঢিল ছুঁড়ে, পাথর মেরে যুলুম করতে পারে তারই বেশি ভক্ত হয়ে পড়ে আর পীরের বুযুর্গীর জাবর কাটে। একে কাশ্‌ফের অধিকারী মনে করে 'মজযূব' বা আত্মহারা আখ্যা দেয়। তাই 'কাশ্‌ফ' তাদের নিকট কামালিয়াতের বিষয়। অথচ উন্মাদ ব্যক্তির 'কাশ্‌ফ' হওয়া বিচিত্র নয়। আমাদের এখানে এক উন্মাদ নারীর 'কাশ্‌ফ' হত, কিন্তু তাকে জুলাপ দেয়া হলে তা শেষ হয়ে যায়। "শরহে আসবাব" গ্রন্থে লিখিত আছে—উন্মাদ রোগে 'কাশ্‌ফ' হতে থাকে। সুতরাং 'কাশ্‌ফ' হওয়া কামালিয়াতের বিষয় নয়। মোট কথা, বুযুর্গীর পরিচিতি না থাকার দরুন বিচিত্র ধরনের মাপকাঠি নিরূপণ করে নেয়া হয়েছে। সাধারণ লোকের তো কথাই নেই বহু ক্ষেত্রে আলিমরা পর্যন্ত তা অবগত নয়।

বহু আলিমকে আমি এ ধরনের লোকের ভক্ত লক্ষ করেছি। আবার কারো দৃষ্টিতে অনর্গল বানোয়াট রটনা রটে যাওয়াই বুযুর্গীর লক্ষণ ও মাপকাঠি। আমাদের এলাকায় এক লোক ছিল, অধিকাংশ জুয়াড়ী তাকে জিজ্ঞেস করত জিতবে কি হারবে। জবাবে সে বিড় বিড় করে কিছু প্রলাপ করত। আর তাদের মহলে কতগুলি সংকেত নির্দিষ্ট ছিল যার আশ্রয়ে সে প্রলাপ দ্বারা তারা নিজেদের মতলব বুঝে নিত। এই হলো মানুষের ভক্তির অবস্থা। কেউ সূফী-রূপ ধারণ করল তো তার সব কথাই বুযুর্গীপূর্ণ। খামুশ থাকলে সে খামুশ শাহ্ পদবী প্রাপ্ত হয়। গালি-গালায আর শরীয়তবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে তো তাকে 'মজযূব' (আত্মহারা) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বুযুর্গী একবার রেজিস্ট্রি হলেই হলো—অতঃপর তমীযা বিবির অযূর ন্যায় তা একদম পোক্ত জিনিস। জনশ্রুতি রয়েছে যে, তমীযা বিবি নামে জনৈকা পতিতা ছিল। কোনও বুযুর্গ ব্যক্তি নসীহত দান করত অযূ করিয়ে তাকে নামায পড়ান এবং তাকীদ করেন—সবসময় এভাবেই পড়বে। এরপর তিনি বিদায় নেন। দীর্ঘদিন পর উক্ত বুযুর্গের সাথে তার সাক্ষাত হলে তিনি তমীযা বিবিকে জিজ্ঞেস করেন—সে নামায

পড়ে কি-না। সে উত্তর দেয় জী-হ্যাঁ, পড়ি। তিনি পুনরায় বললেন—অযূও কি কর ? উত্তরে সে বলে—অযূ সেদিন আপনি করিয়ে দিয়েছিলেন না ? সুতরাং তার অযূ যেন ছিল একেবারে পাকাপোক্ত, প্রস্রাব-পায়খানা এমনকি কু-কর্মের দ্বারাও নষ্ট হয় না। বর্তমানের বুযুর্গীও তদ্রূপ দারুণ পোক্ত জিনিস। কোন অবস্থাতেই তা নষ্ট হবার নয়। তেমনি নামায না পড়লেও বুযুর্গী ঠিকই থাকে।

মোট কথা, ভক্তি একবার জমে গেলে তা আর নষ্ট হয় না। অবশ্য শরীয়তের কথা বলার দোষে নষ্ট হতে সময় লাগে না। তখন বলতে থাকে—মিঞা, এ লোক তো কট্টর মোল্লা মানুষ, শরীয়তের কথা কয়। কিন্তু শরীয়তবিরোধী কথা বললে, ইসলামবিরোধী আচার-আচরণ করলে সে "মা'রিফাতের সাগর" উপাধি লাভ করে। কোন পাপাচার, কোন গুনাহ তাকে নাপাক করতে পারে না, সে যেন সাগর। তাতে নাপাক-আবর্জনা যতই পড়ুক অপবিত্র তাকে থোরাই করতে পারে কিন্তু সাগর যদি হয় প্রস্রাবের তবুও কি পাক-পবিত্রই থাকবে ? মোট কথা, এদের আপাদমস্তক পায়খানায় ভরা। জনৈক পীর সাহেব তার মুরীদনীর গান শুনতে শুনতে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে তাকে নির্জনে ডেকে নিয়ে পাশবিক উন্মাদনায় দু'য়ে মিলে একাকার হয়ে যায়। বাইরে এসে বলে—"আইল যখন জোশ, রইল না আর হুঁশ।" কিন্তু মুরীদের নিকট তবু সে বুযুর্গই রয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ, কি সাংঘাতিক বুযুর্গী! চরিত্র যাই হোক, বুযুর্গের বুযুর্গী অটল।

সার কথা, মুসলমানরা এমন পথ ধরেছে যা সঠিক ইত্তেবা ছিল না, কোথাও যদি হয়েও থাকে তা হয়েছে মাপকাঠিহীন যথেচ্ছভাবে। প্রথমে অভিযোগ ছিল আনুগত্যের। পরে তা হয়েছে বটে কিন্তু মাপকাঠিহীন বিশৃংখল পরিবেশে। সুতরাং কবির ভাষায় ঃ

اگر غفلت سے باز آیا جفا کی

تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی

—অন্যায়-অত্যাচার করার পর তা থেকে বিরত থাকলে আর হলোটা কি জোর জুলুম যা করার তাতো করাই সারা, প্রতিকার করবে কে ?

—ওয়ায- ইত্তিবাউল মুনীব, পৃষ্ঠা ২০

৬৯. পীর ধরার সঠিক মাপকাঠি।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ سبيل من اناب তথা খোদাভীরুদের পথ অনুসরণ কর। অন্ধভাবে যেকোন লোকের অনুসরণ করবে না। কুরআনের বাকমাধুর্য লক্ষ করুন ঃ

واتبع من اناب الى বলা হয়নি। কেননা এতে স্বয়ং সে ব্যক্তির আনুগত্য দাবির সন্দেহ সৃষ্টি হয়। এজন্য سبيل (সাবীল—পথ) শব্দ যোগ করে واتبع سبيل من اناب الى (খোদাভীরু ব্যক্তিবর্গের পথ অনুসরণ কর) বলা হয়েছে যে, সে ব্যক্তি স্বয়ং অনুসরণীয় নয় বরং তার নিকট পথ রয়েছে, মূলত সেটাই হলো অনুসরণীয়। এই হলো অনুসরণের সঠিক মাপকাঠি। অর্থাৎ যার অনুসরণে তুমি আগ্রহী প্রথম দেখে নেবে সে লোক আল্লাহর পথের অনুসারী কি-না। তাই সঠিক অর্থে যে আল্লাহর পথে চলছে তার পথের অনুসরণ করো। সুবহানাল্লাহ, কি আশ্চর্য মাপকাঠি! সুতরাং অন্যসব পথ বর্জন করে অনুসরণ কেবল উক্ত মাপকাঠি অনুসারে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মোট কথা, মহান আল্লাহ খোদামুখী হওয়াকেই মাপকাঠি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর এর অর্থ হলো—আল্লাহ্‌র হুকুম যথাযথ পালন করা। অতএব তিনি বলেছেন ঃ ويهدى اليه من ينيب অর্থাৎ খোদামুখীর জন্য হিদায়েত অনিবার্য। আমল-আখলাক, যাবতীয় কার্যকলাপ খোদায়ী নির্দেশের ভিত্তিতে পরিমার্জিত হওয়াই হিদায়েতের মূল কথা।

অতএব এর দ্বারা বোঝা গেল—তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লার (খোদামুখী) অর্থ হলো আমলের পরিশোধন। তাহলে من اناب الى -এর অর্থ দাঁড়ায় পরিমার্জিত আমলের অধিকারী ব্যক্তি, কিন্তু ইলম বা জ্ঞান দ্বারা আমল অসম্ভব।

অতএব আলোচনার সার কথা হলো—সে ব্যক্তির অনুসরণ কর যার মধ্যে আল্লাহর বিধিবিধানের ইলম এবং সে অনুপাতে আমল উভয়টির সমাবেশ ঘটে। তাহলে এখন মৌলিক দু'টি বিষয় লক্ষ করা যায়। (১) দীনি ইলম এবং (২) দীনি আমল। অথচ মানুষ নিজের পক্ষ থেকে যত মাপকাঠিই নির্ধারণ করে রেখেছে তাতে ইলম ও আমল কোনটাই বর্তমান নেই। অধিকন্তু ইলম ও আমলের সাথে তৃতীয় আর একটি বিষয়ের অস্তিত্ব অনিবার্য, তা-হলো তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা। অতএব প্রথমে ইলম এবং তারপর আমল ও একনিষ্ঠতা থাকা চাই। সুবহানাল্লাহ, কি ব্যাপক কথা যে اناب একটি মাত্র শব্দ-গর্ভে ইলম, আমল ও একনিষ্ঠতা বিষয়ত্রয় নিহিত রয়েছে। বোঝা গেল এ-তিনের সমন্বয় সাধিত ব্যক্তিই অনুসরণযোগ্য। —ইত্তিবাউল মুনীব, পৃষ্ঠা ২৮

৭০. হজ্জের পর কোন কোন লোক চরিত্রহীন কেন হয় ? এর জবাব।

এ প্রসঙ্গে কথা হলো—হজরে আসওয়াদ এক কষ্টিপাথর , একে ছোঁয়ার পর মানুষের জন্মগত স্বরূপ প্রকাশ পায়, যা তার চরিত্রে লুকানো ছিল। স্বভাবে পুণ্যের

উপাদান মুদ্রিত থাকলে এখন আগের তুলনায় তার অধিক পুণ্যবান রূপান্তর ঘটে। একইভাবে অসৎ কর্মের বীজ যদি নিহিত থাকে, তবে অতঃপর সে অধিক মাত্রায় অসৎকর্মে লিপ্ত হয় এবং তার কুপ্রবৃত্তির আত্মপ্রকাশ ঘটে। দৃশ্যত বহু লোক পুণ্যবান মনে হয় কিন্তু কষ্টিপাথরে ছোঁয়া দিলে তার কৃত্রিমতা ধরা পড়ে। কবি বলেছেন ঃ

نقد صوفی نه همه صافی وبے غش باشد
اے بساخرقه که مستوجب آتش باشد
خوش بود گر مهك تجربه آید بمیاں
تاسیه روئی شود هر که دروغش باشد

—দরবেশের মুদ্রা মাত্রই নির্ভেজাল নয়, বহু সূফী জাহান্নামের আগুনের যোগ্য। এ পর্যায়ে অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরের সামনে আসলেই এদের স্বরূপ ধরা পড়বে, তখন ভেজাল মিশ্রিত ব্যক্তি লাঞ্ছিত-অপমানিত হয়ে যাবে।

আপনারা হয় তো বলবেন, ভালই হলো, আপনি ভেদের কথা যাহির করে দিয়েছেন, এখন আমরা তাহলে হজ্জেই রওয়ানা হব না। আমি বলব—জী-না জনাব, হজ্জে যান কিন্তু নিখাঁদ হয়ে রওয়ানা দিন। নিন, তার উপায়ও আমি নির্দেশ করে দিচ্ছি, তা-হলো—যাওয়ার আগে কোন সোনারুর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করুন। এ প্রসঙ্গে কবির কল্পনা প্রণিধানযোগ্য, তিনি বলেন ঃ

کیمیا ئسیت عجب بندگی پیر مغاں
خاك او گشتم وچندیں در جاتم دادند

—সত্য পীরের আনুগত্য বিস্ময়কর স্পর্শমণি, তাঁর সদনে মাটি হওয়া তথা আত্মনিবেদনের ফলে আমাকে তিনি মর্যাদার এহেন উচ্চ স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন।

বলা বাহুল্য, মণিকার দ্বারা নেংটিধারী নয়, আমার উদ্দেশ্য বরং রূহানী মণিকার তথা আল্লাহওয়ালাগণ যাদের অবস্থা হলো—

آهن که بپارس آشنا شد
فی الحال بصورت طلا شد

—লোহা স্পর্শমণির সংস্পর্শে আশা মাত্র মুহূর্তে স্বর্ণখণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

বস্তুত পরশ পাথরের বৈশিষ্ট্য হলো– তার সাথে ছোঁয়া লাগা মাত্র ধাতব লোহা সোনায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। বাস্তবে পরশ পাথরে সে গুণ থাকুক আর নাই থাকুক

কিন্তু আল্লাহওয়ালাগণের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, তাঁদের সাহচর্যের ফলে "তওবা নাসুহ" অর্থাৎ নিষ্ঠাপূর্ণ তওবার সৌভাগ্য লাভ করা যায়। যার পরিণামে পূর্বকৃত যাবতীয় পাপাচারের আবর্জনা পরিষ্কার হয়ে যায়। অতএব কোন আহ্‌লুল্লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার পর তোমরা হজ্জে যাবে। তার সাহচর্যে তোমাদের খাঁটি তওবার তাওফীক হবে। বস্তুত তওবার পর গমন করা হলে হজ্জের প্রতিক্রিয়ায় পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সৎকাজের সৌভাগ্য লাভ হয়। আমার উদ্দেশ্য মুরীদ হওয়া নয়, এর প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র কিছুদিনের সাহচর্য এবং আন্তরিক সম্পর্কের প্রয়োজন। —মাহাসিনুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৩৭

৭১. "কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা নামাযের বৈশিষ্ট্য, তাহলে এর বিপরীত হওয়ার কারণ কি ?" এ সন্দেহের নিরসন।

নামায আমাদের কোন্ স্তরের তা আমরা লক্ষ করি না। জনাব, আপনাদের নামাযের দৃষ্টান্ত হলো, যেমন কেউ বলল—আমার একজন লোকের দরকার আর আপনি তার সামনে কেবল হাড়-মাংস বিশিষ্ট এক পঙ্গু-অচল মানুষ এনে হাযির করলেন। এখন সে যদি অনুযোগের সুরে বলে—এ পঙ্গু দিয়ে আমার কি হবে ? জবাবে আপনি বললেন ঃ জনাব, আপনি লোক চেয়েছিলেন এনে দিলাম, দেখুন সে বাকশক্তিসম্পন্ন প্রাণী কি-না। বলা হবে—যুক্তিবিদ্যার নীতি অনুসারে এবং সৃষ্টির আদলে সে মানুষ ঠিকই কিন্তু যুক্তিগ্রাহ্য লোক নয়। এর দ্বারা মানব সংক্রান্ত কোন কাজ সম্পাদন অসম্ভব। আমাদের নামাযের অবস্থাও একই রূপ, যার হাত-পা, মাথা-মুণ্ড, চোখ-কান বলতে কিছুই নেই। সূক্ষ্মদর্শী আলিমগণ হাড়-মাংসে গড়া পঙ্গু লোকটিকে মানব কাতারে স্বীকার না করার ন্যায় এহেন নামাযও তাঁদের নিকট স্বীকৃত নয়। কিন্তু ফকীহ্‌গণ বিবেচনা করলেন—"এ নামায হয় নাই" বলা হলে মানুষের মধ্যে নামায ত্যাগের প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার প্রবল আশংকা। তাই তাঁরা "একেবারে না হওয়া অপেক্ষা কিছু হওয়া উত্তম"—প্রবাদ সূত্রের প্রেক্ষাপটে এর বিশুদ্ধির হুকুম লাগিয়েছেন। কিন্তু পঙ্গু-অক্ষম লোকটিকে বাকশক্তি এবং কেবল প্রাণ থাকার ভিত্তিতে আপনাদের মানুষ স্বীকার করার ন্যায় এ নামায বিশুদ্ধ হওয়ার হুকুম। কাজেই আপনাদের নামাযও তদ্রূপ কেবল পারিভাষিক ও আক্ষরিক অর্থে নামায, প্রকৃত নামায নয়। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, বেকার মনে করে আর পড়বেনই না। জি-না জনাব, একেবারে মূল্যহীন এটুকুও নয়, অন্তত না হওয়া অপেক্ষা কিছু তো হলো। কেননা রহমতের নযর পড়ে গেলে আল্লাহ্‌র নিকট বন্দেগীর শুধু আকার-

আকৃতিটুকুই গৃহীত হয়ে যায়। এ জাতীয় নামায সম্পর্কে মাওলানা রূমীর দৃষ্টান্ত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

این قبول ذکر تو از رحمت است

چوں نماز مستحاضه رخصت است

—নামাযের মধ্যে অপবিত্র রক্তের প্রবাহ সত্ত্বেও 'মুস্তাহাযা' নারীর নামায শরীয়তের দৃষ্টিতে স্বীকৃত, আমাদের নামাযের অবস্থাও তদ্রূপ যে, প্রকৃতপক্ষে তা প্রাণহীন-শূন্যগর্ভ, কিন্তু কোন কোন সময় কেবল আল্লাহর রহমতে এটাও কবূল হয়ে যায়।

তদুপরি কোন সময় এমনও হতে পারে যে, ধীরে ধীরে ত্রুটিপূর্ণ এ নামাযই একদিন প্রকৃত নামাযের রূপ নেয়া বিচিত্র নয়। যেমন কোন কোন ছাত্র লেখাপড়ায় অমনোযোগী, পড়াশুনায় আগ্রহ কম, কিন্তু দয়াশীল ওস্তাদ তাকে মকতব থেকে বের করে দেন না। তাঁর দৃষ্টিতে উপস্থিত ক্ষেত্রে ছেলেটি যদিও অন্যান্য ছাত্রের ন্যায় মনোযোগী নয় কিন্তু ধীরে ধীরে তার মধ্যে সে আগ্রহের সৃষ্টি অসম্ভব নয়। আর বাস্তবে এ-জাতীয় ঘটনা লক্ষ্যও করা যায়। তাই এসব কারণের প্রতি লক্ষ করেই ফকীহ্গণ এ জাতীয় নামায সম্পর্কে বিশুদ্ধতার হুকুম লাগিয়েছেন। বাস্তবিক ফকীহগণের অস্তিত্ব উম্মতের জন্য রহমতস্বরূপ। তাই নিজেদের নামাযকে আপনারা একেবারে মূল্যহীন অথবা পরিপূর্ণ কামেল মনে না করাই সমীচীন।

অতএব এতক্ষণের আলোচনা দ্বারা تنهى عن الفحشاء والمنكر অর্থাৎ "নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে" আয়াতের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের মানসিকতা ও চরিত্রে তার প্রভাব স্বভাবত লক্ষ না করার পিছনে কি কারণ থাকতে পারে?" এ প্রশ্নের জবাব বর্ণিত হয়ে যায় যে, সেটা নিখুঁত (كامل) নামাযের প্রতিক্রিয়া। কিন্তু আপনাদের নামায তদ্রূপ নয়, তাই এর প্রভাবের প্রতিফলন লক্ষ করা যায় না। জওশেন্দা চূর্ণ করে সেবনের ন্যায় আমাদের নামাযের আদায় কদর্য পন্থায় তাহলে বলুন, এর উপকার আমাদের ভাগ্যে কিরূপে জুটতে পারে। দ্বিতীয়ত, যেমনি আমাদের নামায তেমনি তার বারণ। নামায যদি কামেল—ত্রুটিমুক্ত হতো তাহলে যাবতীয় অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখা এর পক্ষে বিচিত্র ছিল না। এখন নামায যেহেতু ত্রুটিপূর্ণ তাই তার বারণও আনুপাতিক হারে স্বল্প মাত্রার। অতএব অভিজ্ঞতার আলোকে অনস্বীকার্য যে, নামাযী ব্যক্তি সাধারণত তুলনামূলকভাবে পাপাচারে কমই লিপ্ত হয়। নিম্নতম লাভ তো এই যে, অন্তত কাফিররা তাকে পথভ্রষ্ট করতে উদ্যত হয়

না। নামাযী ব্যক্তিকে তারা পাকা দীনদার মনে করে কুফরীর দাওয়াত থেকে রেহাই দিয়ে থাকে। তাদের ধারণা এ ব্যক্তির আমাদের ধোঁকায় পাক খাওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত। —ঈওয়াউল ইয়াতামা, পৃষ্ঠা ৬১

৭২. মি'রাজে আল্লাহ্র দীদার লাভ সম্পর্কিত সন্দেহের জবাব।

দুনিয়াতে আল্লাহ্র দীদার বা দর্শন লাভ করা প্রাকৃতিক নিয়ম ও শরীয়ত উভয় দিক থেকে অসম্ভব। অবশ্য জ্ঞানগতভাবে তা অসম্ভব নয়। কেননা জ্ঞানগত সম্ভবের কোন অস্তিত্ব নেই। বস্তুত 'নস' ভিত্তিক (কুরআন-হাদীস) প্রমাণ অনুসারে আল্লাহ্র দীদার হবে পরকালে।

বলা বাহুল্য, দুনিয়াতে দর্শন লাভ সম্ভব না হওয়ার কারণ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নয়, বরং এর কারণ আমাদের পক্ষ থেকেই যে, আমরা তার যোগ্য নই। আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখিরাত সর্বত্র জ্যোতির্ময়, চির উজ্জ্বল, তাঁর মধ্যে কোন অস্পষ্টতা অকল্পনীয়। এখন هو الظاهر والباطن বাক্য দৃষ্টে কারো মনে প্রশ্ন আসতে পারে—এর দ্বারা বোঝা যায় বাতিন (অস্পষ্ট) আল্লাহ্র অন্যতম সিফত এবং তাঁর সত্তায় অদৃশ্যতা বিদ্যমান। অতএব তাঁর মধ্যে "অন্তরায় নেই' মন্তব্য কতটুকু সঙ্গত? মুহাক্কিক মনীষীবৃন্দ এর জবাবে বলেছেন ঃ 'খেফা' (অন্তরায়)-এর দরুন আল্লাহ্ 'বাতিন' নন, বরং আল্লাহ্র সীমাহীন প্রকাশই এর মূল কারণ। পুনরায় প্রশ্ন আসে—তাহলে তো বাতিন না হয়ে তাঁর প্রকাশ হওয়াই উচিত ছিল? আসল কথা হলো—আমাদের অনুভূতির জন্য তাঁর মধ্যে অন্তরায় থাকা প্রয়োজন। কোন বস্তু আদৌ অদৃশ্য না হলে তাকে অনুভব করা সম্ভব নয়। কারণ আকর্ষণ দ্বারাই বস্তুর প্রতি অনুভূতির সৃষ্টি, আর আকর্ষণের জন্য অন্তরায় প্রয়োজন। সর্বদিক থেকে উপস্থিত বস্তুটির প্রতি আকর্ষণ জন্মে না। এ কারণেই 'রূহ' মানুষের সর্বাধিক নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও একে অনুভব করা যায় না। দেহের শিরা-উপশিরা ও রন্ধ্রে রন্ধ্রে এর অবাধ চলাচল। অথচ এর প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। কাজেই সীমাহীন প্রকাশের দরুন তিনি বাতিন। সময়ে অন্তরালে চলে যায় বলেই আমাদের চিন্তায় রোদের অনুভব। অনুরূপ অন্ধকারের দরুন আলোর অনুভব আর আঁধারের অপসৃতির নাম আলো। দ্বিতীয়ত, অন্তরায় না থাকাবস্থায় আলোর কোন স্বাদ বা মূল্য থাকে না। রাতের বেলা আলো অদৃশ্য হয় বলেই দিবসের আনন্দ। কবির ভাষায় ঃ

از دست هجر یار شکایت نمی کنم

گر نیست غیبتے نه دهد لذت حضور

—বন্ধুর বিচ্ছেদে আমার কোন অভিযোগ নেই, যেহেতু অদৃশ্যের অবর্তমানে উপস্থিতির কোন স্বাদই পাওয়া যায় না।

মোটকথা, মহান আল্লাহ্ সদা প্রকাশের দরুন আমাদের নযরে অন্তর্নিহিত। আমাদের অনুভূতি দুর্বল যা কেবল সময়ে অদৃশ্য হয় এমন জিনিসের সাথেই সম্পৃক্ত হতে পারে সর্বদিক থেকে প্রকাশ এমন বস্তুর সাথে নয়। অবশ্য আখিরাতে আমাদের অনুভূতি ও বোধশক্তি প্রখরতর রূপ নেবে, ফলে অনাবিল প্রকাশের (ظاهر من كل وجه) সাথেও সে সম্পৃক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে। রূহ সেখানে আত্মপ্রকাশ করে আল্লাহ্র দীদারে ধন্য হবে। তখন প্রমাণ হবে যে, অন্তরায় মূলত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নয়, আমাদের পক্ষ থেকেই ছিল। আমাদের চোখের শক্তি ছিল না তাঁকে দেখার, পেঁচা যেরূপ সূর্যের কিরণ সইতে অক্ষম। এ প্রসঙ্গে জনৈক কবির কল্পনা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ

شد هفت پرده بر چشم ایں هفت پرده چشم

بے پرده در نه ماهے چوں آفتاب دارم

—চোখের সাত পর্দাই তাঁর দর্শন লাভে অন্তরায়। অন্য কথায় চোখ নিজেই বাধার সৃষ্টি করে রেখেছে, নতুবা সেদিক থেকে বাধার কিছুই নেই। সূর্য তার আলো ছড়াচ্ছে অথচ তোমার চোখে হাত, তাহলে অন্তরায় তোমারই পক্ষ থেকে, সূর্যকে অন্তরাল বলা যাবে না।

প্রসঙ্গত لا يبقى على وجهه الا رداء الكبرياء (কিবরিয়াই শ্রেষ্ঠত্ব) পর্দা ব্যতীত তাঁর চেহারায় পর্দামাত্রই বাকি থাকবে না] হাদীসে উল্লিখিত পর্দা খোদাই সত্তার ভেদ-রহস্য উদঘাটনে প্রতিবন্ধক বটে কিন্তু দীদারের পরিপন্থী নয়। আখিরাতে আমাদের শাণিত দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে আল্লাহ্র দর্শন লাভে আমরা ধন্য হব—কথা এটুকুই। এর জন্য খোদার রহস্য জানা নিষ্প্রয়োজন। যেমন এ দুনিয়াতেও আমরা বহু জিনিস দেখতে পাই অথচ তার রহস্য আমাদের অজ্ঞাত।

মোটকথা, পার্থিব জগতে আল্লাহ্র দীদার প্রাকৃতিক কারণেই অসম্ভব। সুতরাং মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে— انكم لم تروا ربكم حتى تموتوا (মৃত্যুর পূর্বে তোমাদের রবকে তোমরা আদৌ দেখতে পাবে না)। তদুপরি কুরআনে মূসা (আ)-এর আবেদনের জবাবে ইরশাদ হয়েছে—لن ترانى (কখনো তুমি আমায় দেখতে পাবে না)। এখানে লক্ষণীয় যে, তার জবাবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে لن ارى -এর স্থলে لن ترانى বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমার পক্ষ থেকে অন্তরায় বলতে কিছুই নেই, আমি তো এখানেও দর্শনযোগ্য। কিন্তু দর্শন ক্ষমতার অভাবে তোমরাই বরং আমায় দেখতে পাবে না। হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্কে দেখেননি এটাই আলিমগণের সর্ববাদীসম্মত অভিমত। কারণ দুনিয়াতে তাঁর দর্শন লাভ করা প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী অসম্ভব। অবশ্য তাঁর তাজাল্লী বর্ষিত হয়েছিল আর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পর্দা সরানোও হয়েছিল কিন্তু মূসা (আ) দেখার আগেই চেতনা হারিয়ে ফেলেন। অবশ্য মি'রাজ-রজনীতে মহানবী (সা) আল্লাহ্র দীদার পেয়েছিলেন কি-না এ সম্পর্কে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-সহ কোন কোন সাহাবা, অধিকাংশ আলিম ও সূফীর মতে রাসূলুল্লাহ (সা) দর্শন করেছিলেন। একই সাথে এ প্রসঙ্গেও সবাই একমত যে, দীদার সম্পর্কিত হাদীস দ্বারা সূরা নাজমের ব্যাখ্যা যথার্থ নয়। কারণ— علمه شديد القوى ذو مرة (তাকে শিক্ষাদান করেন শক্তিশালী, প্রজ্ঞাসম্পন্ন সত্তা) আয়াতে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের দাবি অনুসারে এর অর্থ হযরত জিবরাঈল (আ)। কেননা আল্লাহ্র প্রতি شديد القوى -এর প্রয়োগ শুদ্ধ নয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এ অংশটুকু স্মরণ রেখে সামনে চলুন— فاستوى وهو بالافق الاعلى (সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল, তখন সে ঊর্ধ্ব দিগন্তে) আয়াতেও যমীরের (সর্বনাম) প্রত্যাবর্তন জিবরাঈল (আ)-এর প্রতি। কারণ استوى وهو بالافق (নিজ আকৃতিতে দিগন্তে স্থিতি)-এর বৈশিষ্ট্য তাঁর সাথেই সংশ্লিষ্ট হতে পারে। অতঃপর— ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى (অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হলো, অতি নিকটবর্তী, ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা তার চাইতেও কম।) আয়াতের যমীর সমূহ আল্লাহ্র দিকে নয়, জিবরাঈল (আ)-এর প্রতি প্রত্যাবর্তিত। অন্যথায় সমজাতীয় যমীরের (সর্বনাম) মধ্যে পরস্পর বিচ্ছিন্নতা অনিবার্য হয়ে পড়ে। জিবরাঈলের এ দর্শন ঘটেছিল পার্থিব জগতে। অতঃপর বলা হয়েছে— ولقد راه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى (নিশ্চয়ই তাকে সে আরেকবার দেখেছিল প্রান্তবর্তী কুল বৃক্ষের নিকট।) দ্বিতীয়বারের এ দর্শন হয়েছিল সিদরাতুল মুনতাহার নিকট। মহানবী (সা) যদিও জিবরাঈল (আ)-কে একাধিকবার প্রত্যক্ষ করেছিলেন কিন্তু এখানে দুইবার মাত্র নিজস্ব আকৃতিতে দর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উক্ত আয়াতের তাফসীর জানতে চাইলে তিনি বললেন ঃ هو جبريل অর্থাৎ তিনি ছিলেন জিবরাঈল। আর যে সকল উলামা শবে মি'রাজে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহান আল্লাহ্র দীদারে ধন্য হওয়ার পক্ষপাতী তাঁদের দলীল সূরা নাজমের আলোচ্য আয়াত নয় বরং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর সূত্রে সহীহ মুসলিম এবং মুস্তাদরাকে হাকেম সূত্রে আল্লামা সুয়ূতী বর্ণিত মারফূ' হাদীস। অতএব কুরআন যদিও দীদার

প্রশ্নে নীরব কিন্তু যেহেতু এ সকল শীর্ষস্থানীয় সাহাবী তার প্রমাণ দিচ্ছেন তাই বুঝতে হবে নিশ্চয়ই তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট থেকে শুনেছেন।

এখন মহানবীর দীদার যেহেতু প্রমাণসিদ্ধ বিষয় তাই উল্লিখিত আলিমগণ তাঁকে "দুনিয়াতে আল্লার দীদার অসম্ভব"-এ নীতির ঊর্ধ্বে স্থান দিয়ে থাকেন। তারা বলেন ঃ দুনিয়াতে দর্শন অসম্ভব হওয়ার মূল কারণ হলো দর্শকের অযোগ্যতা। নতুবা দর্শনীয় সত্তায় (مرئى) অন্তরায়ের কোন অস্তিত্ব নেই। শায়খ ইবনুল আরাবী বিষয়টির সূক্ষ্মতম এক ব্যাখ্যায় বলেছেন—রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নীতির ঊর্ধ্বে রাখা নিষ্প্রয়োজন, একে ব্যাপকার্থবোধক স্বীকার করা হলেও তাঁর দীদারে কোন প্রকার ত্রুটি আসে না। কেননা আমরা মি'রাজে দীদারের সমর্থক আর মি'রাজ সংঘটিত হয়েছে আরশ পর্যন্ত। আরশ ও সামাওয়াত মাকানে আখিরাত (পরকালীন জগত) এবং দুনিয়ার গণ্ডিবহির্ভূত স্থান। তাহলে স্বীকার করাতে অসুবিধা নেই যে, সেখানকার প্রভাব ও বৈশিষ্ট্য এই যে, মরণের আগে অথবা পরে সে জগতের আওতায় যে-ই পদার্পণ করুক মহান আল্লাহ্র দীদার সহ্য করার মত শক্তিসম্পন্ন দৃষ্টিশক্তি লাভ করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। যেমন ঈসা (আ) এখন আকাশে বর্তমান। কিন্তু সেখানে পানাহার ও প্রশ্রাব-পায়খানা থেকে পবিত্রতা বজায় রেখে কেবল আল্লাহ্র যিক্র দ্বারা তিনি জীবন্ত। এর কারণ একটাই। আর তা হলো, পার্থিব জগতের নয়, এখন তিনি পর জগতের বাসিন্দা, যে জগতের বৈশিষ্ট্য দুনিয়ার স্বভাব-ক্রিয়া থেকে ভিন্ন ধরনের। খাওয়া দাওয়া থেকে মল-মূত্র তৈরি হওয়া এ জগতের বৈশিষ্ট্য কিন্তু সেখানকার খাদ্যে সম্ভবত এরূপ না-ও হতে পারে। গতি দ্বারা দেহে তাপ সৃষ্টি হওয়া যদিও ইহজাগতিক বৈশিষ্ট্য কিন্তু সেখানে সম্ভবত এরূপ না হওয়ারই নিয়ম। এ জগতের কার্যকলাপ, আচার-আচরণ ওজনবিহীন অথচ পরজগতের ক্রিয়াপ্রভাবে এগুলোও সেখানে ওজনশীল। মৃত্যু এ জগতের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য কিন্তু জীবন আখিরাতের একক বৈশিষ্ট্য। সে জগতে কেউ পা রাখা মাত্র মৃত্যুর হাত থেকে চির অব্যাহতি লাভ করে। যেমন কাশ্মীরের প্রশংসায় কোন কবি বলেছেন ঃ

هر سوخته جانے که به کشمیر در آید

گر مرغ کباب است که بابال وپر آید

—যে কেউ কাশ্মীরে আসুক নবযৌবন লাভ করা তার জন্য অবধারিত। এমনকি কাবাব করা মুরগীও যদি কাশ্মীরে পৌঁছে যায়, তার দেহে পর্যন্ত নতুন ডানা ও পালক গজাবে।

যা হোক, কথাটা যদিও কবির অতিরঞ্জন কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত যে, বিশ্বের সকল অংশ অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয় বরং কোন কোন স্থান ও নগরের বিশেষত্বে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান লক্ষণীয়। কোন দেশের মানুষ দীর্ঘায়ু, আবার কোন দেশের মানুষ স্বল্পায়ু, কোন অঞ্চলের লোকজন দুর্বল-ক্ষীণ আবার কোন স্থানের মানুষ শক্তিশালী, স্বাস্থ্যবান ও বলিষ্ঠদেহী হয়ে থাকে। এক এলাকায় রোগ-ব্যাধি, কলেরা-বসন্ত লেগেই আছে, আবার অন্য এলাকার লোকজন এ সবের নামই জানে না। একই বিশ্বের বিভিন্ন অংশে যখন এতই ব্যবধান তাহলে পরজগতের স্থানের গুণ-বৈশিষ্ট্য দুনিয়া থেকে ভিন্নতর হওয়াতে অবাক হওয়ার কি আছে ? দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে সার্বিক তুলনা করা অযৌক্তিক। কাজেই এর পর আমল-আখলাক, কার্যকলাপের ওজন এবং আল্লাহ্র দীদারের ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। মুতাযিলাদের বিবেক বিপর্যয়ের মারে বিক্ষত যে, অনুপস্থিতকে উপস্থিত আর অদৃশ্যকে দৃশ্যের সাথে তুলনার ভিত্তিতে এসব বিষয়কে তারা অস্বীকারের দুঃসাহস দেখিয়েছে। অথচ এ ধরনের কিয়াস বা তুলনা বাতিল হওয়া সুস্পষ্ট।

যা হোক, শায়খ ইবনুল আরাবীর গবেষণার সার কথা হলো—স্থান ও কাল হিসেবে আখিরাত দু'পর্যায়ে বিভক্ত। আখিরাতের কাল (زمان اخرت) শুরু হবে মৃত্যুর পর থেকে আর আখিরাতের স্থান (مكان اخرت) এখনই বর্তমান রয়েছে। সুতরাং আহলে সুন্নাতের আকীদা মতে জান্নাত ও জাহান্নাম এখনই বর্তমান। তাহলে তা কোথায়, দুনিয়াতে ? যদি দুনিয়ায় তার অস্তিত্ব মেনে নেয়া হয়, তাহলে সে ব্যক্তির কথাই সঙ্গত যে বলে—"সারা বিশ্বের ভূগোলশাস্ত্র চষে বেড়ালাম তাতে জান্নাত-জাহান্নামের অস্তিত্বই খুঁজে পেলাম না।" হকপন্থীদের পক্ষ থেকে এর উত্তরে বলা হয়—তুমি কেবল দুনিয়ার ভূগোলই পড়েছ, এ ছাড়া আখিরাতেরও ভূগোল রয়েছে যা তোমার পাঠ্যসূচির বাইরে, তোমার সুযোগই হয়নি সেটা অধ্যয়নের। আখিরাতের ভূগোল পাঠেই জানতে পারবে তা আছে কি-না এবং কোথায় ? অতএব হকপন্থীরা এর অস্তিত্ব তালাশ করেন দুনিয়ায় নয়, আখিরাতে (পরজগতে)। বোঝা গেল মাকানে আখিরাত এখনও বিদ্যমান এবং "যমানে আখিরাতের" (পরকাল) ন্যায় "মাকানে আখিরাতেও" (পর জগতের স্থান) দীদার বা দর্শন লাভ করা সম্ভব, দর্শক যদিও এখন পর্যন্ত পরকালের আওতায় প্রবেশ করেনি। অতএব মহানবী (সা)-এর সপক্ষে যে দীদার প্রমাণ করা হয় তা এ জগতের নয় বরং ঊর্ধ্ব জগতের বিষয়। যেহেতু জাগতিক দীদার মহানবী (সা)-এর পক্ষেও সম্ভব নয়। মানবীয় গুণ-বৈশিষ্ট্যে যদিও কামিল ও পূর্ণাঙ্গ কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মানুষ। —তাহসীলুল মারাম, পৃষ্ঠা ৫

৭৩. দরূদ পাঠ করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি অনুগ্রহের মনোভাব পোষণ করা ভুল।

যদি কেউ বলে যে, আমরা "দরূদ পাঠ করি আর সেজন্য রাসূলুল্লাহ (সা) উপকৃত হন" তাহলে তার জবাবে আমি বলব—মহানবী (সা)-এর উপকার ততটুকু নয় যতটুকু লাভ খোদ আপনাদের। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্র বাণী প্রণিধানযোগ্য। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ يايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما (অর্থাৎ হে মুমিন-গণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং যথাযথভাবে তাকে সালাম জানাও।) একটা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথাটা আরো পরিষ্কার করা যাক। মনে করুন—চাকরকে আপনি বললেন—এখানে হাজার টাকা, আমার ছেলেকে দেয়ার জন্য তুমি সুপারিশ কর। এর দ্বারা চাকরের মান বাড়ানোই আপনার উদ্দেশ্য এবং এটা একটা বিকল্প ব্যবস্থা মাত্র। তার অর্থ এ নয় যে, টাকা পাওয়ার জন্য আপনার ছেলে চাকরের মুখাপেক্ষী। এখন চাকর যদি সুপারিশ না-ও করে তবুও টাকা ছেলের জন্য বরাদ্দ হয়েই আছে, যথারীতি সে পাবেই। চাকরের মর্যাদা বৃদ্ধিই এর লক্ষ্য। দরূদ শরীফের অবস্থাও তদ্রূপ। আমরা দরূদ পড়ি আর না পড়ি আল্লাহর অনুগ্রহ তিনি পাবেনই। কেননা এর পূর্বেই—ان الله وملئكته يصلون على النبى (নিশ্চয়ই আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে) মর্মে আয়াত বর্তমান রয়েছে। কিন্তু আমাদের মর্যাদা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে—দরূদ পাঠাও তোমাদের নিজেদের মঙ্গল সাধিত হবে। কাজেই কোন্ মুখে এ কথা আসতে পারে যে, তিনি আমাদের মুখাপেক্ষী এবং আমাদের বলার প্রেক্ষিতে তাঁর প্রতি অনুগ্রহ বর্ষিত হবে। সম্ভবত এটা কোন অনুর্বর মস্তিষ্কের চিন্তা, তাই পরিষ্কার করে দেয়া হলো।

বস্তুত মহানবী (সা)-এর সাথে আল্লাহর আচরণ আমাদের আবেদন-নির্ভর নয়। আলিমগণ এর প্রমাণ স্বরূপ লিখেছেন ঃ অন্যান্য ইবাদত কোন সময় কবূল হয় কোন সময় কবূল হয় না, না-মঞ্জুর হয়ে যায়। কিন্তু দরূদ শরীফ আল্লাহর দরবারে সর্বদা মকবুল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণে আমাদের আমলের কোন প্রভাব যদি সত্যিকার অর্থে থেকেই থাকে, তবে অন্যান্য আমলের ন্যায় দরূদও সময়ে কবূল সময়ে না-মঞ্জুর হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সর্বদা কবূল হওয়া প্রমাণ করে যে, তাঁর প্রতি রহমতের জন্য আমাদের আমলের আদৌ কোন প্রভাব নেই। আমরা দরূদ পাঠাই বা না পাঠাই তাঁর প্রতি খোদায়ী রহমতের অবিরত বর্ষণ চলতেই থাকে। রহমত আল্লাহ পাঠাবেনই, এটা তাঁর সিদ্ধান্ত। তাই দরূদ কখনো না-মঞ্জুর হয় না। এমতাবস্থায় আমাদের প্রতি দরূদের নির্দেশ আমাদেরই মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে।

বলা বাহুল্য, মানগত দিক থেকে আমাদের আমল কবূলের যোগ্য নয়। আর প্রত্যাখ্যাত আমল না হওয়ারই শামিল। এ হিসাবে আমাদের দরূদও মূল্যহীন। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওপর রহমতের ধারা বর্ষণ অবিরত চলছেই। এটাকে কারো দরূদের প্রতিক্রিয়া মনে করা ভুল চিন্তা। সূর্যের আলোকে আমরাও আলোকিত হই কিন্তু আলোক বিকিরণে সূর্য আমাদের মুখাপেক্ষী নয়। অতএব "লাভালাভের বেলায় মহানবী (সা) কারো মুখাপেক্ষী নন" আলিমগণের উক্তি দ্বারা এ কথার প্রতি জোর সমর্থন লক্ষ করা যায়। অবশ্য অপর এক প্রশ্নের অবকাশ এখানে থেকে যায় যে, মহানবী (সা) আমাদেরকে দীন শিখিয়েছেন এবং আমাদের যাবতীয় আমলের সওয়াব তিনিও লাভ করেন। তাই আমরা আমল না করলে এত সওয়াব তিনি কিভাবে লাভ করবেন ? কাজেই বোঝা গেল এতে আমাদের আমলেরও দখল রয়েছে। এর জবাব হলো—নেক নিয়তে তিনি আমাদের শিখিয়েছেন কাজেই যেকোন অবস্থায় তিনি সওয়াব লাভের অধিকারী। এখন আমাদের আমলের প্রতিক্রিয়া কেবল এতটুকু যে, উম্মতের আমলের সংবাদ পেয়ে তাঁর অন্তর খুশি হয়। নতুবা আমাদের দ্বারা তাঁর কোন লাভ নেই। —যিকরুর্ রাসূল, পৃষ্ঠা ৩

৭৪. মসজিদ ও মাহফিলের সাজ-সজ্জা অপব্যয় ও মাকরূহ।

সাধারণত আজকাল মসজিদকে বিভিন্ন সাজ-সজ্জায় চাকচিক্যময় করে তোলা হয়। আর ইসলামী সভা-সমিতির তো কথাই নেই। এগুলোকে একেবারে যাত্রামঞ্চে পরিণত করা হয়। যুক্তি দেয়া হয় যে, আমরা বিজাতীয়দের পশ্চাতে পড়ে থাকা সঙ্গত নয়। আমি বলব– জনাব, বিজাতীয়দের মুকাবিলা আপনাদের দ্বারা সম্ভব নয়। তাদের সাথে সম্পদের পাল্লায় আপনাদের ভারসাম্য কোথায় ? তারাও যদি প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে তবে আপনাদের পরাজয়ের গ্লানি নিশ্চিত। কাজেই কাফিরদের সাথে প্রতিযোগিতার মনোভাব ত্যাগ করে জনাব রাসূলুল্লাহ (সা) এবং সাহাবীগণের অনুসরণে আপনারা অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে চলুন। বস্তুত একজন নিষ্ঠাবান মুসলমানের অবস্থা যেরূপ হওয়া উচিত। কবির ভাষায় ঃ

دل فریباں نباتی همه زیور بستند

دلبر ماست که حسن خداداد آمد

—সুন্দরী রূপসীদের সারা অঙ্গ অলংকার সজ্জিত কিন্তু আমার প্রিয়া খোদা প্রদত্ত রূপ লাবণ্যে বিভূষিতা।

ইহুদী, খৃস্টান, হিন্দু, সবাই জাঁকজমক ও জলুস নিয়ে বের হোক আর তাদের মুকাবিলায় একজন মুসলমান আসুক জীর্ণ-শীর্ণ বস্ত্র পরে, আল্লাহ্‌র কসম! মুসলমানের খোদাপ্রদত্ত রূপের বন্যায় তাদের সকল চাকচিক্য তলিয়ে যাবে, ভেসে যাবে। জনাব, আল্লাহ্ আপনাকে এমন অপরূপ রূপ-সৌন্দর্য মণ্ডিত করেছেন যে, ধার করা কৃত্রিম সৌন্দর্য আপনার প্রয়োজনই নেই। হে সুন্দর! আল্লাহ্ তোমাকে এতই রূপ দিয়েছেন যা দেখে চন্দ্র-সূর্য পর্যন্ত লজ্জিত। পাউডার লাগিয়ে খোদাপ্রদত্ত সে লাবণ্য ঢাকার এ প্রয়াস তোমার কোন্ দুঃখে? নিজের রূপ তোমার অজ্ঞাত, এ মেকি রূপ তোমার আসল সৌন্দর্যকে অন্তরালে নিয়ে যাচ্ছে। অতএব মুতানাব্বীর ভাষায় ঃ

حسن الحضارة مجلوب بتطرية

وفى البداوة حسن غير مجلوب

—"শহুরে মেয়েদের রূপ-লাবণ্য সাজ-সজ্জা ও পরিচর্যাকেন্দ্রিক কিন্তু পল্লীবালাদের দেহ-কান্তি খোদা প্রদত্ত।"

বস্তুত শহুরে কৃত্রিম রূপসী অপেক্ষা সুন্দরী পল্লীবালা শত গুণে উত্তম-সুদর্শনা, যারা পরিশ্রমী এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। জনাব, ইসলামী জলসার সৌন্দর্য এতটুকু যথেষ্ট নয় কি যে, ইসলামের সাথে এর নিবিড় সম্পর্ক এবং ইসলামের নামে তার আয়োজন। দো-জাহানের শাহানশাহের দরবাররূপে একে আখ্যা দেয়া হয়েছে অথচ দিল্লী সম্রাট অথবা ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের দরবারসম কিংবা ইউরোপীয় নাট্যমঞ্চের ন্যায় একে সুসজ্জিত করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাহলে বোঝা গেল—কাক হয়ে তোমরা ময়ূর নাচের ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছিলে আর অপমানের বোঝা মাথায় নিয়েছ। জনাব, জলসা এমন হওয়া উচিত দূর থেকে যেন ইসলামের স্মৃতি চিহ্ন চমকাতে থাকে, নাচ রং কিংবা সার্কাস-থিয়েটার মঞ্চ নয়। বাইরে থেকে মনে হবে একেবারে সাদাসিধা আর ভিতরে থাকবে সাহাবীগণের চরিত্র-রঞ্জিত। বাজারের নারীদের ন্যায় কণ্ঠে ফুলের মালা, দামী দামী পোশাক, প্রতিটি পদে, চলনে-বলনে অর্থবিত্তের গর্ব-অহংকার আর ঠমকের বাহাদুরী অথচ আসলের ঘর ফাঁকা। বাস্তব সাক্ষীর নির্দেশ এটাই যে, রং ঢং, সাজ-সজ্জা আর রূপ চর্চায় অগ্রণী তারাই, যাদের মাল আছে কামাল (গুণ-বৈশিষ্ট্য) নেই। নতুবা তাদের আচার-আচরণে ধন অপেক্ষা গুণের অনুশীলন থাকত পরিমাণে অধিক। কাজেই তারা গুণের বদলে ধনের প্রকাশ

ঘটায়। এ প্রসঙ্গে মাওলানা রুমী-প্রদত্ত উপমা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—মাথার দোষ লুকাবার উদ্দেশ্যে টেকো ব্যক্তির সুন্দর টুপির সযত্ন ব্যবহার। কিন্তু কালোকেশীর আগ্রহ মাথায় তার টুপিই না উঠুক। লোকেরা দেখুক তার কৃষ্ণ চুল আর সিঁথির বাহার। বন্ধুগণ! আমি কসম করে বলতে পারি, অন্তরে যার সত্যের মানিক, বাহ্যিক আড়ম্বরে থাকবে তার অনীহা আর ঘৃণার ভাব। কিন্তু সত্য ও সুন্দর-মুক্ত হৃদয়ের আগ্রহ কেবল বাহ্যিক ঠাট আর লৌকিক জাঁকজমকের প্রতি। ইসলামী জলসা যতই জাঁকজমকপূর্ণ হোক কিন্তু তা ইসলামের ন্যায় আড়ম্বরহীন হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

মোটকথা, সভা-সমিতিতে বিভিন্ন ওয়ায়েয একত্র করার উদ্দেশ্য কেবল গর্ব-অহংকার আর প্রদর্শনী বাতিক। এর অপর উদ্দেশ্য হলো—মানুষের বিভিন্ন রুচি অনুপাতে একাধিক বক্তার সমাবেশ ঘটানো, যাতে সভা জমজমাট হয়। আমি বলতে চাই খাঁটি দীনি সভা যদি আপনার উদ্দেশ্য হয়, তবে মানুষের রুচি-অরুচির কি প্রয়োজন? কেউ টাকা বণ্টন করা শুরু করলে তো প্রচার লাগে না, এমনি কত ফকীর জমা হয়। "টাকার সাথে মিষ্টিও দেয়া হবে" প্রচারণার কি প্রয়োজন? তাহলে তো বোঝা গেল আপনার টাকা জাল। আপনার সদাই যদি নির্ভেজাল থাকে, তবে সারি গাওয়া ছাড়াই বিক্রি দিয়ে কুলাতে পারবেন না। নতুবা সারি তো গাওয়া লাগবেই। ভাই সাহেব, দোকানে খাঁটি পণ্য রাখুন। দেখবেন আপনা আপনি খরিদ্দারের দারুণ ভিড় জমে গেছে। তদ্রূপ মনে রাখতে হবে—'সত্য' আকর্ষণহীন বিষয় নয়। হকপন্থী আর জালিয়াতের ভাষায় রাজ্যের ব্যবধান। শেষোক্ত ব্যক্তির বক্তব্যের সূচনা বড় চোটের আর রঙ্গীন ভাষায়, কিন্তু সারমর্ম সারি গাওয়া ভিন্ন কিছুই নয়। পক্ষান্তরে হকপন্থী আল্লাহওয়ালাগণের কথা শুরু হয় নরম সুরে কিন্তু শেষ হয় জোরে বলিষ্ঠ কণ্ঠে এবং এতে মানুষের মনে স্থায়ী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তাঁদের কথার সূচনা হালকা বৃষ্টির ন্যায় ধীরে ধীরে শুরু হয় এবং মানব অন্তর ক্রমান্বয়ে তা শুয়ে নেয়। পরিণামে তা উর্বর, সবুজ-সতেজ গুলবাগিচায় আত্মপ্রকাশ করে। মাওলানা রুমীর ভাষায় ঃ

در بهار اں کے شود سر سبز سنگ

خاك شو تا گل بروید رنگ برنك

—"বসন্তের আগমনে চতুর্দিকে সবুজের সমারোহ কিন্তু তোমাকে মাটি হতে হবে, তবেই রং বেরংয়ের ফুল ফুটবে।"

লোভী মতলববাজরা রং জমানোর উদ্দেশ্যে প্রথমে মসনবীর ছন্দ আওড়ায়, আজকাল কোথাও কোথাও ঢোল-ডঙ্গর, তবলা-হারমোনিয়াম বাজিয়ে ওয়াযের সভা

গরম করা হয় আর বক্তৃতার ভাষা হয় চটকদার। উপস্থিত ক্ষেত্রে সভা বেশ জমে—উত্তেজনাও হয় কিন্তু সভাও শেষ ক্রিয়াও খতম। সামান্য কিছু থাকলে তাও দু-চার দিনের জন্য। হকপন্থীদের কথার ক্রিয়া যদিও রঙ্গিন নয় কিন্তু বড় স্থায়ী ও ফলপ্রসূ। এ-দুয়ের পার্থক্য যেমন—জং ধরা রূপার টাকা আর চটকদার আবরণের চামচ। মরিচাসহই টাকার দাম ষোল আনা কিন্তু চটকদার দস্তার চামচ কেউ কিনে না। যদি বা কেউ নিলই তাতে কি সীসার দাম বেড়ে যাবে? মোট কথা, টাকার জন্য শুভ্রতার চমক নিষ্প্রয়োজন কিন্তু রূপা অপেক্ষা চটকদার গিল্টির ফুটানি দুই দিনের, অতঃপর কানাকড়ি দাম নেই। কবি বলেন ঃ

نقد شو فی نه همه صافی بے غش باشد

اے بسا خرقه که متوجب آتش باشد

—"দরবেশের কার্যকলাপ মাত্রই বিশুদ্ধ নির্ভেজাল নয়, বহু জুব্বাধারী দরবেশ জাহান্নামের উপযোগী।"

কষ্টিপাথরে হাযির করা হলে টাকা তো নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে যায় পরীক্ষার জন্য কিন্তু গিল্টির চামচ শরমে মুখ লুকায়। কবির ভাষায় ঃ

نه باشد اهل باطن درپئے آرائش ظاهر

به نقاش احتیاجے نیست دیوار گلستاں را

—আহ্‌লে বাতেন তথা অধ্যাত্মপন্থিগণ বাহ্যিক আড়ম্বর প্রয়াসী নন, উদ্যান প্রাচীরের জন্য যেরূপ চিত্রকরের শিল্পকর্ম নিষ্প্রয়োজন। কেননা উদ্যানের বসন্ত বাহারই তার জন্য যথেষ্ট।

মহানবী (সা)-এর জীবনের এই ছিল মূল দর্শন। বাহ্যিক লৌকিকতা, শান-শওকত ও আড়ম্বরের চিহ্নও তাঁর জীবনাচরণে অকল্পনীয়। তিনি ছিলেন সীমাহীন স্থিরতা ও ক্ষমতার অধিকারী এবং সত্য-সুন্দরের মহান প্রতীক। তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন অনাড়ম্বর এবং নিঃসংকোচ চরিত্রের অধিকারী।

—ইসলাহুল ইয়াতামা, পৃষ্ঠা ১২

৭৫. হযরত আম্বিয়া (আ) এবং আউলিয়াগণের মরণোত্তর জীবনের প্রমাণ।

মহানবী (সা)-এর দেহ মুবারক রওযা পাকে বর্তমান থাকার দরুন এর মর্যাদা অতি উর্ধ্বে। হকপন্থী আলিম সমাজ এবং সাহাবা কিরামের মতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং সশরীরে রওযা পাকে জীবন্ত রয়েছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

ان نبی الله حی فی قبره یرزق

"রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজ কবর শরীফে জীবিত রয়েছেন এবং তিনি রিয্ক প্রাপ্ত হন।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—তাঁর এ জীবন জাগতিক জীবনের বাইরে এক ভিন্নতর জীবন। প্রশ্ন হতে পারে—মানুষ মাত্রই বরযখী জীবনের অধিকারী এতে নবীর বিশেষত্ব কোথায়? উত্তর হলো, এ জীবনের বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। এক পর্যায়ে সকল মু'মিন সমভাবে শরীক, যার দরুন প্রত্যেক মুসলমানের কবরের শিক্ষা অনুভূত হবে। দ্বিতীয় স্তরের জীবন লাভ করবেন শহীদগণ। তাঁদের জীবন মু'মিনদের জীবন অপেক্ষা উন্নত মানের। মু'মিনদের বরযখী জীবন পার্থিব জীবন অপেক্ষা উন্নততর হওয়া সত্ত্বেও তা শহীদগণের জীবনের তুলনায় দুর্বল ও নিম্ন পর্যায়ের হবে। কিন্তু কারো পক্ষে এ কথা ভাবা ঠিক নয় যে, সাধারণ মু'মিনদের বরযখী জীবন তাদের নিজেদের পার্থিব জীবন অপেক্ষা দুর্বল থাকবে। শহীদগণের উন্নত মানের জীবন প্রাপ্তির ফলশ্রুতিস্বরূপ তাঁদের লাশ গ্রাস করা যমীনের পক্ষে সম্ভব হবে না এবং এই না খাওয়া জীবনেরই প্রতিক্রিয়া ও নিদর্শন। সুতরাং সাধারণ মু'মিনদের বিপরীত শহীদগণের জীবনের এ জাতীয় প্রতিক্রিয়া-প্রকাশ তাঁদের শক্তিশালী ও উন্নততর জীবনের প্রমাণ। কেউ কেউ একে অস্বীকার করে বলেছে—বাস্তব অবস্থা শহীদগণের লাশ সম্পর্কিত আলোচ্য আকীদার বিপরীত। কিন্তু এ দাবি শহীদী জীবন অস্বীকারের কারণ হতে পারে না। কারণ, উক্ত আকীদার বিপক্ষ প্রমাণের ন্যায় বাস্তবের সপক্ষ প্রমাণও লক্ষ করা যায়। কাজেই উভয় প্রকার প্রমাণ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় বিষয়টিকে একেবারে অস্বীকার করা অযৌক্তিক দাবি। বড় জোর এটাকে সার্বিক নিয়ম না বলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর বাস্তবতার স্বীকৃতির দাবি তোলা যায়। 'নসের' (কুরআন-হাদীসের প্রমাণ) মর্মও তাই বলা যায়। কিন্তু সমূলে অস্বীকার করে দেয়াটা সঠিক হতে পারে না। এ জবাব তখনি খাটে যদি আমরা স্বীকার করে নেই যে, বিতর্কিত লোকটি শহীদই ছিল। কিন্তু সম্ভাবনা তো এটাও রয়েছে যে, লোকটি মূলত শহীদই ছিল না। কেননা প্রকৃত শাহাদত শর্তসাপেক্ষ ব্যাপার। কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হওয়ার নামই শাহাদত নয়। যেমন নিয়তের পরিশুদ্ধি যে, একমাত্র আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে হতে হবে। যার খবর আল্লাহ্ ছাড়া কারো জানা নেই। তাই আমরা বলতে পারি, যাকে আপনারা বিপরীত অবস্থায় লক্ষ করেছেন প্রকৃতপক্ষে সে শহীদই ছিল না, ছিল কেবল নামসর্বস্ব শহীদ। অথচ উন্নত মর্যাদা কেবল প্রকৃত শহীদের প্রাপ্য। আর যদি মেনেও নেয়া হয় যে, প্রকৃতপক্ষে সে শহীদই ছিল, তাহলে সম্ভাবনা এ-ও তো রয়েছে যে, বিশেষ কোন কারণে তার লাশ মাটিতে মিশে গেছে। যেমন সে স্থানের মাটিতে লবণাক্ততার

আধিক্য ছিল। "শহীদের লাশ আগুনে পোড়ালেও দাহ্য হবে না" এরূপ দাবি আমরা কবেই বা করেছিলাম। আমাদের দাবি বরং এই ছিল যে, অন্যান্য মুর্দার ন্যায় শহীদের লাশ নিয়মমত দাফন করা হলে এবং ভূমির লবণাক্ততা কিংবা অন্য কোন ব্যতিক্রম দেখা না দিলে অন্যসব মুর্দার ন্যায় শহীদের লাশ পচে-গলে মাটিতে মিশে যাওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে।

তৃতীয় স্তরের সর্বাধিক শক্তিশালী জীবন আম্বিয়া (আ)-গণের। তাঁদের বরযখী জীবন শহীদ অপেক্ষা শক্তিশালী ও উন্নত মানের। সুতরাং তাঁদের দেহের এক ধরনের প্রভাব তো এই যে, মাটির পক্ষে শরীর মুবারক খেয়ে ফেলা সম্ভব নয় যা অনুভবযোগ্য। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

حرم الله اجساد الانبياء على الارض

"আল্লাহ্ পাক মাটির জন্য নবীগণের (আ) শরীর মুবারক হারাম করে দিয়েছেন।" দ্বিতীয় প্রভাব অনুভবযোগ্য নয় কিন্তু কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তা হলো—নবী (আ)-গণের ইন্তিকালের পর উম্মতের কোন ব্যক্তির পক্ষে তাঁদের সম্মানিত স্ত্রীগণকে বিয়ে করা জায়েয নয়। অধিকন্তু তাঁদের ত্যাজ্য সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টিত হয় না। মহানবী (সা)-এর বাণী ঃ

نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقة

অর্থাৎ "আমরা নবীগণ কোন উত্তরাধিকার রেখে যাই না, আমরা যা রেখে যাই তা সাদকা হিসেবে গণ্য হবে।" অথচ শরীয়ত শহীদগণের জন্য এ বিধান সাব্যস্ত করেনি। শরীয়ত যদিও এর বিশেষ কোন রহস্য উল্লেখ করেনি, কিন্তু মুহাক্কিক আলিমগণের মতে—আম্বিয়াগণের শক্তিশালী জীবনের অন্তরায় আলোচ্য বিষয়দ্বয় বৈধ না হওয়ার মূল কারণ।

উল্লেখ্য, ইন্তিকালের পর উম্মতের জন্য নবীর স্ত্রীগণের বিয়ে করার নিষেধাজ্ঞা সকল নবীর জন্য যদিও প্রমাণিত নয়, কুরআনে কেবল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা উল্লেখ রয়েছে কিন্তু মীরাসের সাথে তুলনা করে আলিমগণ সমস্ত নবীর স্ত্রীগণের ক্ষেত্রেও এ হুকুম ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করে থাকেন। আর হাদীসে মীরাস বণ্টনের অবৈধতা সকল নবীর ক্ষেত্রেই প্রমাণিত। সুতরাং এ সমস্ত বিশেষত্বের প্রেক্ষিতে সাধারণ মু'মিন ও শহীদান অপেক্ষা আম্বিয়াগণের উন্নতমানের বরযখী জীবনের প্রমাণ পাওয়া যায়।

মোটকথা, কবরে আম্বিয়াগণের জীবিত থাকা সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণিত। বিশেষত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বরযখী জীবন ইসলামবিরোধী লোকদের নিকট পর্যন্ত স্বীকৃত সত্য। সুতরাং "তারীখে মদীনা" (মদীনার ইতিহাস) গ্রন্থে বর্ণিত একটি ঘটনা দ্বারা তাদের স্বীকৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে ঘটনাটি আমি নিজে পড়েছি। মহানবী (সা)-এর ইনতিকালের কয়েক শতাব্দী পর (কোন্ সম্রাটের শাসনামলে ঘটেছিল এখন স্মরণে আসছে না) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেহ মুবারক স্থানান্তর করার উদ্দেশ্যে দুই ব্যক্তি মদীনা আগমন করে। মসজিদে নববীর পাশেই ঘর ভাড়া নিয়ে সারা দিন তারা নামায-তাসবীহ ইত্যাদিতে নিমগ্ন থাকত। এতে মানুষ তাদের ভক্ত হয়ে পড়ে। এদিকে রাতের বেলা হতভাগা পাপিষ্ঠরা তাদের সে ঘর থেকে রওযা পাক বরাবর সুড়ঙ্গ খনন করে এবং রাতের আঁধারে মদীনার বাইরে মাটি সরিয়ে জায়গা পরিপাটি করে রাখত, যাতে কেউ টের না পায়। কয়েক সপ্তাহ যাবত তারা সুড়ঙ্গ পথ খননের কাজ অব্যাহত রাখে। এদিকে তাদের এ তৎপরতা শুরু হওয়ার সাথে সাথেই মহান আল্লাহ্ তৎকালীন বাদশাহ্‌কে (নামটা আমার স্মরণে আসছে না) স্বপ্নযোগে হুঁশিয়ার করে দেন। স্বপ্নে তিনি মহানবী (সা)-কে চিন্তাক্লিষ্ট ও বিষণ্ণ বদন দেখতে পান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্রাটের নাম ধরে ইরশাদ ফরমান ঃ এ দু-ই ব্যক্তি আমায় কষ্ট দিচ্ছে, শীঘ্র আমাকে এদের হাত থেকে মুক্ত কর। স্বপ্নে তাঁকে সে দু-ব্যক্তির আকার-আকৃতি এবং হুলিয়া পর্যন্ত দেখিয়ে দেয়া হয়। নিদ্রা ভঙ্গের পর সম্রাট মন্ত্রীর নিকট ঘটনা বর্ণনা করেন। মন্ত্রী বললেন ঃ মনে হয় মদীনায় কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। আপনি অনতিবিলম্বে সেখানে উপস্থিত হন। সম্রাট সৈন্য-সামন্তসহ অতি দ্রুত মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি মদীনা উপনীত হন। ততদিনে তারা দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথ খুঁড়ে একেবারে দেহ মুবারকের নিকট পৌঁছে গিয়েছিল। বাদশাহ্‌র আগমনে আর একদিন বিলম্ব হলেই তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়ে যেত। এখানে পৌঁছেই তিনি শহরবাসী সকলকে মদীনার বাইরে এক স্থানে জমায়েত এবং নির্দিষ্ট এক ফটক দিয়ে বের হওয়ার হুকুম দেন। নিজে দরজায় দাঁড়িয়ে সকলকে গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে থাকেন। এক সময় সকল পুরুষের নির্গমন শেষ হয়ে আসে কিন্তু স্বপ্নে দেখা দু-ব্যক্তির চেহারা নযরে পড়ছে না। বিস্ময়াবিষ্ট নয়নে সম্রাট লোকদের প্রশ্ন করেন—সবাই কি এসে গেছে ? তারা জবাব দিল—জী হ্যাঁ, ভিতরে এখন আর কেউ নেই। সম্রাট বললেন—কখনো হতে পারে না, অবশ্যই ভিতরে কেউ রয়ে গেছে। জনগণ বলল—দু-জন দরবেশ লোক রয়ে গেছে তারা কারো দাওয়াতে যায় না, কারো সাথে মেলামেশাও করে না। সম্রাট বললেন—আমার এদেরকেই দরকার। সুতরাং ধরে এনে তাদের হাযির করা হলে স্বপ্নে দেখা অবিকল সে চেহারাই

সম্রাট তাদের মধ্যে দেখতে পান। সাথে সাথে এদের বন্দী করার হুকুম দেয়া হয়। অতঃপর এদের জিজ্ঞেস করা হয়—রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তোমরা কি ধরনের কষ্ট দিয়েছ ? দীর্ঘ সময় পর তারা স্বীকার করে যে, দেহ মুবারক বের করার উদ্দেশ্যে আমরা সুড়ঙ্গ পথ তৈরি করেছি। সম্রাট নিজে সে সুড়ঙ্গ প্রত্যক্ষ করে দেখতে পান—তারা কদম মুবারক পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। সম্রাট কদম মুবারকে ভক্তিপূর্ণ চুমো খেয়ে সুড়ঙ্গ পথ বন্ধ করে দেন এবং কবরের তলদেশে পানির স্তর পর্যন্ত চতুর্দিকে সীসা গলিয়ে ঢালাই করে দেন, ভবিষ্যতে কেউ যেন সুড়ঙ্গ পথ খনন করার সুযোগ না পায়।

এই ঘটনা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, মহানবী (সা)-এর দেহ মুবারক অক্ষত রয়েছে—ইসলামের দুশমনরা পর্যন্ত তার প্রতি এত দৃঢ় বিশ্বাসী যে, কয়েক শতাব্দী পরও তারা তা বের করার অপচেষ্টা চালিয়েছিল। তাদের সে বিশ্বাসই যদি না থাকবে, তাহলে তাদের সুড়ঙ্গ খনন করার কি কারণ ? কেবল সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কারো পক্ষে এ ধরনের আত্মঘাতী পদক্ষেপ কল্পনা করা যায় না। তারা আহলে কিতাব (কিতাবধারী), তাদের স্পষ্ট বিশ্বাস ছিল যে, নবীর দেহ মাটিতে মেশা অসম্ভব। মহানবী (সা) সত্য নবী এ কথার প্রতি তাদের পূর্ণ আস্থা ছিল। স্বীকৃতি দিচ্ছে না কেবল শত্রুতাবশে। মোট কথা—পক্ষ-বিপক্ষ, শত্রু-মিত্র সবার মতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শরীর মুবারক আজো পর্যন্ত সম্পূর্ণ অক্ষত ও নিরাপদ রয়েছে।

—আল-হুবূর, পৃষ্ঠা ১৪

৭৬. ইলমে তাজবীদ শিক্ষা করা ফরয, উদাসীনতা উচিত নয়।

তাজবীদ এত প্রয়োজনীয় যে, এর অভাবে কোন কোন সময় আরবীর বিশেষত্বই নষ্ট হয়ে যায়। আর শব্দের আরবীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যাওয়ার অর্থ—তা কুরআন থেকে খারিজ হয়ে যাওয়া। তাহলে এর দ্বারা নামায কি করে শুদ্ধ হবে ? তাজবীদের অভাবে শব্দের আরবীয়ত্ব নষ্ট হওয়ার কথা শুনে আপনাদের হয় তো অবাক লাগবে। কিন্তু দলীল দ্বারা আমি এর প্রমাণ দেব। একথা সবাই জানে যে, আরবী, ফারসী, উর্দু পৃথক পৃথক ভাষা এবং প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। কোন শব্দ ফার্সী বা উর্দু হওয়ার জন্য তার উচ্চারণ নির্ভুল থাকা শর্ত। শব্দের আরবী হওয়ার জন্যও একই শর্ত জরুরী। যেমন—'গাঢ়া' ও 'গারা' দুটি শব্দ। প্রথমটি কাপড় জাতীয়, দ্বিতীয়টি মাটির তৈরি। এখন উভয় শব্দের শেষ বর্ণ ঢ় ও র-এর স্থানচ্যুতির দরুন অর্থের তারতম্য হওয়া স্বাভাবিক। কেননা 'গারা' বলতে কাপড় বোঝায় না আবার 'গাঢ়া' মাটির তৈরি জিনিস নয়। তদ্রূপ আরবী বর্ণমালার ث (ছা)-এর স্থলে سين (সীন) অথবা صاد (সাদ) পড়া হলে কিংবা ح (হা)-এর স্থলে ه (ছোট হা) পড়া হলে শব্দের উচ্চারণ ও অর্থ উভয়ই বদলে যাবে। এর দ্বারা শব্দ বিশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। অনুরূপ বর্ণের صفت (বৈশিষ্ট্য) যথাযথ আদায় করাও অনিবার্য। যেমন—পাংখা, রঙ্গ, সঙ্গ ও জঙ্গ শব্দসমূহের 'ন' বর্ণটি নাসিকামূল থেকে অস্পষ্ট আওয়াজে উচ্চারিত হয়। এখন 'ন' বর্ণটি পূর্ণ প্রকাশ করে 'পানখা', 'রনগ', 'সনগ' ইত্যাদি উচ্চারণে পড়া হলে আপনারা কিছুতেই শুদ্ধ পড়া হলো স্বীকার করবেন না বরং বলবেন এটা উর্দু বা ফার্সী রইল না, অর্থহীন শব্দ হয়ে গেল। সুতরাং এখানে যেরূপ শব্দের উচ্চারণ ও অর্থগত ভুল এবং উহার ভাষাচ্যুতি পর্যন্ত আপনাকে স্বীকার করে নিতে হলো, একইরূপে আরবী শব্দের স্পষ্ট উচ্চারণের স্থলে অস্পষ্ট উচ্চারণের দরুন তা আরবী শব্দ রইল না বলে আপনিই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। তাহলে এখনো কি তাজবীদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কারো প্রশ্ন থাকতে পারে ? আমি তো বলি—তাজবীদ তথা ইলমে কিরাআত শিক্ষা করা ফরয। কারণ তাজবীদ ব্যতীত আরবীর বিশুদ্ধ উচ্চারণ সম্ভব নয়। সুতরাং তাজবীদ শিক্ষা ফরয। বন্ধুগণ! মনের দুর্বলতার দরুন আপনাদের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট না হতে পারে, কিন্তু বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে তাজবীদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো—দৃশ্যত পার্থিব লাভ পরিলক্ষিত না হওয়ার কারণে এদিকে মুসলমানদের আকর্ষণ-আগ্রহ কম। কিন্তু আজ যদি আইন করা হয় যে, বিশুদ্ধ কুরআন পাঠকারীই কেবল সরকারী চাকরির যোগ্য বিবেচিত হবে, তাহলে বি. এ., এম. এ. পাস করা সবাই আজ কারী হয়ে যাবে। পার্থিব সম্পদের আশায় আমরা সব কিছু করতে প্রস্তুত। তাই ওযর-আপত্তি যা কিছু করা হয় সবই বাহানা মাত্র।

—আসবাবুল ফিতনাহ্, পৃষ্ঠা ২৬

৭৭. উলামাদের পারস্পরিক মতবিরোধের প্রেক্ষিতে উভয়পক্ষকে বর্জন করার সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ।

এটা এক কঠিন প্রশ্ন, যা মুসলমানদেরকে দ্বিধাগ্রস্ত করে রেখেছে। উলামাদের মতবিরোধ তারা গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ করে যে, কোন বিষয় এক পক্ষের মতে হারাম তো সে একই বিষয় অপরপক্ষ জায়েয বলে ফতোয়া দিচ্ছে। কোনটিকে এক পক্ষ সুন্নত সাব্যস্ত করলে অপর পক্ষের মতে তা বিদআত। এমতাবস্থায় আমরা কাকে মানব আর কাকে পরিত্যাগ করব ? সবাইর কথায় আমল করা তো সম্ভব নয়। এক পক্ষকে অপর পক্ষের ওপর প্রাধান্য দিলে তার ভিত্তিই বা কি হবে ? এ জাতীয় প্রশ্ন মুসলমানদেরকে বিপাকে ফেলে দিয়েছে। তাই কেউ কেউ সিদ্ধান্ত নিয়েছে সবাইকে

বর্জন করার। বন্ধুগণ! এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু দুঃখ এ জন্য যে, একই মতভেদ যখন পার্থিব বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে দেখা দেয় তখন সে ক্ষেত্রে এ সিদ্ধান্ত না নিয়ে এক পক্ষের প্রাধান্য কেন গৃহীত হয়? অর্থাৎ প্রায়শ এমনটি হতে দেখা যায়—কোন রোগীর চিকিৎসা বিষয়ে চিকিৎসকদের ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন রকম দাঁড়ায়, একেকজন একেক রকম ব্যবস্থাপত্র লিখে। আর তাদের প্রত্যেকেই নিজের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত এবং প্রতিপক্ষের ব্যবস্থাকে মারাত্মক ভ্রান্ত আখ্যা দেয়। এ ক্ষেত্রে আপনাদের পক্ষ থেকে সকল চিকিৎসককে কেন বর্জন করা হয় না আর কেন বলা হয় না, আফসোস! চিকিৎসকদের মধ্যে ঐক্য নেই। যাও রোগীকে মরতে দাও, কারো চিকিৎসারই দরকার নেই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যে কোন একজনের প্রাধান্য বিবেচনা করে তার হাওয়ালায় রোগের চিকিৎসা কেন চলতে দেয়া হয়? অনুরূপ আলিমদের ন্যায় আচরণ উকীলদের বেলায় কেন করা হয় না। উকীলদের মধ্যে কি মতবিরোধ ঘটে না? অবশ্যই ঘটে কিন্তু সেক্ষেত্রে উকীলদের একজনকে অপরের ওপর নিশ্চয়ই প্রাধান্য দেয়া হয়। এক্ষেত্রে তো সকল উকীলকেই বর্জন করা হয় না? আপনাদের কাছে এ প্রশ্নের কি জবাব? চলুন আমি নিজেই এ রহস্যের জট খুলে দেই। তাহলো বিষয়বস্তু দু ধরনের হয়। প্রথমত যেগুলোকে প্রয়োজনীয় মনে করা হয়, দ্বিতীয়ত যে সব বিষয় দরকারী জ্ঞান করা হয় না। এখন বাস্তবের ভাষা হলো—মতবিরোধের দরুন প্রয়োজনীয় বিষয় বাদ দেয়া হয় না। মতভেদ সত্ত্বেও বিবেক-বিবেচনা দ্বারা একটিকে অপরটির ওপর প্রাধান্য দিয়ে ব্যবস্থা একটা করাই হয়। আর মতপার্থক্য ইত্যাদির কারণে নিষ্প্রয়োজনীয় বিষয় ছেড়ে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে চেষ্টা-তদবীরের ঝামেলায় যাওয়া হয় না। এই হলো মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি। এরই প্রেক্ষাপটে এখানেও বিচার করা হয় যে, মানুষের মধ্যে প্রাণ ও ঈমান দুটি জিনিস বিদ্যমান। প্রাণ যেহেতু মানুষের প্রিয় জিনিস,কাজেই নিরাপত্তার খাতিরে "গুণীজনদের পারস্পরিক মতবিরোধ হয়েই থাকে"—এ নীতিবাক্যের আশ্রয়ে উপায় খোঁজা হয় যে, ঘাবড়ে গেলে চলবে কেন, নিজেদের মঙ্গলকামীদের পরামর্শ এবং বিচার-বিবেচনার দ্বারা সর্বাধিক বিজ্ঞ চিকিৎসকের আমরা শরণাপন্ন হব। কিন্তু ঈমান যেহেতু প্রিয় নয় তাই আলিমদের মতভেদের ক্ষেত্রে নিজেদের বিবেক খাটিয়ে চিন্তা-ভাবনার পরিশ্রমে মন সায় দিতে চায় না। কাজেই ভাইসব! ঈমানকেও যদি প্রিয়বস্তু মনে করা হতো, তা হলে বিজ্ঞ চিকিৎসক নির্বাচনের ন্যায় যোগ্যতম আলিম বাছাই করাটা আদৌ কষ্টকর ছিল না। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় হলো—ঈমানের অপ্রিয়তার দরুন আলিম মাত্রই বর্জনীয় মনে করা হয়। অবশ্য মতভেদের প্রেক্ষিতে আলিমরা ত্রুটিমুক্ত

আমার কথা এটা নয়, দোষ তাদের অবশ্যই রয়েছে এবং কে দোষী পরবর্তী পর্যায়ে তার প্রতি আমি ইঙ্গিত দেব কিন্তু আপনাদের আচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ অবশ্যই করব যে, সে মতবিরোধের অজুহাতে সবাইকে বর্জনীয় সাব্যস্ত করা ঈমানের অপ্রিয়তার পরিচায়ক। মতভেদের দরুন কেউ কেউ পরামর্শ দেয়—আলিমদের একমত হওয়া উচিত, অনৈক্য নিন্দনীয়। তাহলে আমি জিজ্ঞেস করি—মতবিরোধ মাত্রই কি অপরাধ? নাকি এর কোন শর্ত-শরায়েতও আছে? অনৈক্য যদি শর্তহীন অপরাধ এবং এ কারণে উভয় পক্ষ অপরাধী সাব্যস্ত হয়, তাহলে কোর্টে মামলা দায়ের করামাত্র শুনানির আগেই আদালতের উচিত বাদী-বিবাদী উভয়ের শাস্তি বিধান করা। কারণ অভিযোগ এবং অস্বীকৃতির দরুন উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ প্রমাণিত হয়েছে, যা শর্তহীন অপরাধ আর আসামী-ফরিয়াদী উভয়ে সমভাবে সে অপরাধে অপরাধী। আদালতের এ জাতীয় সিদ্ধান্তে সর্বাগ্রে আপনাদের পক্ষ থেকেই প্রতিবাদের ঝড় তোলা হবে—"এই কি ন্যায়বিচারের নমুনা, মামলা তদন্তের আগেই উভয় পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করা হলো!" যদি কেউ আপনার প্রতি প্রশ্ন উত্থাপন করে—"তাহলে করণীয় কি ছিল?" বিজ্ঞের ন্যায় আপনিই তখন রায় দেবেন—বাদী-বিবাদী উভয়ের বিরোধপূর্ণ বিষয়টি যথাযথ তদন্তপূর্বক ন্যায়-অন্যায় চিহ্নিত করে—"দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন" এই স্বীকৃত নীতি অনুসারে অপরাধীর দণ্ডবিধান বাঞ্ছনীয় ছিল। নিন, আপনার বিচার দ্বারাই প্রমাণ হলো যে, অনৈক্য ও মতবিরোধ মাত্রই অপরাধ নয়। সত্যনিষ্ঠ মতভেদ নয় বরং ন্যায়-নীতি বিবর্জিত অনৈক্যই আসলে অপরাধ। বস্তুত কোন বিষয়ে দুই দল হয়ে যাওয়াতে উভয়পক্ষই অপরাধী আখ্যা পাওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। অন্যায় মতভেদকারীই মূলে অপরাধী, ন্যায়নিষ্ঠ বিরোধকারী নয়। অতএব, উলামাদের পারস্পরিক মতভেদের দরুন ঢালাওভাবে উভয় দলকে অপরাধী সাব্যস্ত করে প্রত্যেক পক্ষকে প্রতিপক্ষের সাথে আপসরফা এবং ঐক্য স্থাপনের নির্দেশ দেয়া ভ্রান্ত রায়। প্রথমত আপনার বরং উচিত হবে ন্যায়-অন্যায় যাচাই করা, অতঃপর অন্যায়কারীকে অপরাধী সাব্যস্ত করে হকপন্থীর সাথে ঐক্য স্থাপনে বাধ্য করা। নতুবা হকপন্থীকে প্রতিপক্ষের সাথে আপসে বাধ্য করার অর্থ এই দাঁড়ায়—হক ও ন্যায়নীতি পরিহার করে অন্যায় পন্থা অবলম্বনে উৎসাহ যোগানো। এ যুক্তি কোন বিবেকবান ব্যক্তি সমর্থন করতে পারে না। আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এটুকুই যে, তদন্ত না করেই আপনারা সকলের প্রতি ঐক্যের আহবান জানাচ্ছেন। অবশ্য আলিমদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে আমাদের নেই তা নয়। কিন্তু সেটা কেবল না-হকপন্থীদের বিরুদ্ধে। যদি বলা হয়—জনাব! অপর পক্ষও আপস করতে বাধ্য। কেননা যেটা

তাদের জ্ঞানে ধরে এবং যতটুকু বুঝে আসে তাই তারা হক মনে করে। তাহলে জনাব, এ জাতীয় মতভেদ তো আল্লাহ্‌র রহমত, এর দ্বারা ফিতনা-ফাসাদ আসতে পারে না। লক্ষ করুন, আমাদের চার ইমামের মধ্যে মতবিরোধ তো কেবল বুঝের মধ্যেই। অতঃপর সবাই তাঁরা একমত। একে অপরের বিরুদ্ধে তাঁদের কারো কোন নিন্দাবাদ নেই, কটাক্ষ বা বিদ্রূপ সমলোচনাও নেই। প্রত্যেকেই একে অপরকে হকপন্থী মনে করেন। মতবিরোধের ধরন যদি এই হতো তাহলে মুসলমানদের বর্তমান বিপর্যস্ত অবস্থা হওয়ার কথা ছিল না। বর্তমানের এ মতভেদ মূলত রুটি প্রসূত বিরোধ। আমি বলে থাকি—হকপন্থীদের কাছে যদি যথেষ্ট অর্থ থাকত আর ঐসব দল-উপদলের জন্য মাসিক বেতন ধার্য করে দেওয়া যেত তাহলে সব রকম মতানৈক্য এক দিনেই শেষ হয়ে যেত। এসব মতভেদ শুধু স্বার্থকেন্দ্রিক। সুতরাং কেউ মিলাদের ওপর, কেউ ফাতিহার ওপর আবার কেউ চল্লিশার ওপর জোর দেয়। এক বিদআতী মৌলবীকে কেউ জিজ্ঞেস করল—আপনি মৌলুদ-ফাতিহার মহিমায় পঞ্চমুখ এবং এর বিরোধীদের গালমন্দ দিয়ে থাকেন অথচ আপনার পরিবারের মহিলারা বেহেশতী জেওর পাঠ করে, এর কারণ কি ? (উল্লেখ্য, আল্লাহ্‌র মেহেরবানী বেহেশতী জেওর কিতাবখানা সারা দেশের মুসলমানরা পরিবারের মহিলাদের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করে থাকে, সে যে পন্থীই হোক না কেন। সুতরাং উক্ত মৌলবীর পরিবারের মহিলারাও বেহেশতী জেওর পাঠ করত)। নিজ পেটের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বললেন—এই হলো সমস্ত মতভেদের মূল। অন্যথায় বেহেশতী জেওরের বক্তব্যই সঠিক। লক্ষ্ণৌতে একবার প্রতিটি খাদ্যের ওপর পৃথক পৃথক ফাতিহা পাঠের রেওয়াজ লক্ষ করলাম। এক পর্যায়ে সেখানে কিছু বলার সুযোগ হলে আমি বললাম—দরূদ-ফাতিহা সুন্নত কি বিদআত তা পরীক্ষার সহজ উপায় হলো—দরূদ-ফাতিহা পাঠকারী মৌলবীদের নযরানা কিছুই না দিয়ে তাদের দ্বারা বেশি বেশি মৌলুদ পড়াতে থাকুন, পৃথক পৃথক তশতরীতে ফাতিহা পড়িয়ে নিন কিন্তু মণ্ডা-মিঠাই, টাকা-কড়ি নযরানা মোটেই দেবেন না। দেখবেন তারা নিজেরাই একে বিদআত বলে প্রচার শুরু করবে।

সুতরাং কেউ কেউ এর ওপর আমল করলে সেদিনই সন্ধ্যায় ফাতিহা খাঁ মৌলভী সাহেব বলতে লাগলেন, পৃথক পৃথক ফাতিহা পড়া বাস্তবিকই একটা ফালতু বাজে প্রথা মনে হয়, একটাই তো যথেষ্ট। মনে মনে বললাম, এখন তো বুঝবেই। (নযরানা নাই কি-না!) বন্ধুগণ! আমার কথা হলো—তাদের আমদানি বন্ধ করে দিন, দেখবেন তারা নিজেরাই প্রচার করবে—"এসব ঠিক নয়, ফালতু রেওয়াজ।" মূলত এসব রুজি-রোজগারের বাহানা মাত্র।

একবার এলাকায় জোর মহামারী দেখা দিলে লক্ষ করলাম সানা পড়া, ফাতিহা দেয়া, দশমী ইত্যাদি সব রহিত হয়ে গেল। নীরবে দেখতে থাকি। মহামারীর প্রকোপ কমে আসলে লোকদের বললাম—কি ভাই, সানা-ফাতিহা ইত্যাদি কি হলো ? দশমী ইত্যাদি বন্ধ কেন ? বলতে লাগল—হুযূর, এসবের অবসর কোথায় ? বললাম—ছেড়ে দিয়েছ ? বলল, না। আমি বললাম—মনে রাখবে, যে কাজ বন্ধ হয়ে যায় বুঝতে হবে সেটা দীনের কাজ ছিল না, ছিল অবসর কাটানোর ব্যবস্থা। আর দীনের কাজ শত ব্যস্ততার মধ্যেও ছাড়া যায় না। অতএব, সে নিরুত্তর হয়ে গেল। একবার জনৈক গ্রাম্য লোক বলতে লাগল—ফাতিহা পাঠে ক্ষতিই বা কি বরং সূরা-কিরাআতের সওয়াব দ্বারা মৃতের উপকারই হয়। বললাম—উপকার তো কেবল খাদ্যদ্রব্যের সাথে নির্দিষ্ট নয়, টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড় দ্বারাও তো সম্ভব। তাহলে টাকা-কড়ি, কাপড়-চোপড়ের ওপরও কি কখনো ফাতিহা পড়া হয় ? কখনো না। না কেন ? সূরার সওয়াব পৌঁছত, তাতে মৃতের উপকারই তো ছিল। বলতে লাগল—বস্, বুঝে আসছে, আপনি ঠিকই বলছেন।

ভাইগণ! পরিষ্কার কথা, এসব পন্থা আমদানির লক্ষ্যে আবিষ্কৃত। মৌলুদ পাঠকারীদের আমদানি বন্ধ করে দেয়া হলে দেখবেন তারাও আমাদের ভাষায়ই কথা বলছে। এ সভায় সকল স্তরের মানুষের বোধগম্য মোটা কয়টি কথা রাখলাম, সুন্নত-বিদআতের পরিচয়ের সঠিক পন্থা জানা থাকা সত্ত্বেও তার তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা করা হয়নি। কবি বলেন ঃ

مصلحت نیست که از پرده بروں افتد راز

ورنه در مجلس رنداه خبرے نیست که نیست

—ভেদের কথা বাহিরে প্রকাশ না করাই উত্তম, নতুবা আল্লাহ্‌ওয়ালাদের অজানা-অজ্ঞাত কোন খবরই নেই।

অবশ্য কেউ যদি জানার আগ্রহ প্রকাশ করে এবং আমাদের সাহচর্য গ্রহণ করে তাকে সে উপায় নির্দেশ করা যেতে পারে।

মোটকথা, আমার বক্তব্য ছিল মতবিরোধ মাত্রই অভিযোগের লক্ষ্য হতে পারে না; বরং প্রথমে আপনাদেরকে সত্য নির্ণয় করে নিতে হবে। অতঃপর লক্ষ করুন, মতবিরোধকারী পক্ষদ্বয়ের কে হকের ওপর আর কে না-হক পথে দণ্ডায়মান। এভাবে হক-বাতিলের পরিচয় জানা যেতে পারে। আরেকটা সহজ পথ আমি ব্যক্ত করছি। মানুষ সাধারণত শিক্ষিত ও অশিক্ষিত দু-রকম হয়ে থাকে। শিক্ষিতরা যদি উর্দু

শিক্ষিতও হয়, তবে এদের পক্ষে সত্য যাচাইয়ের নিয়ম হলো—নিরপেক্ষ ও পরিচ্ছন্ন মন-মানসিকতা নিয়ে উভয় পক্ষের আলিমদের লিখিত গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করবে। পক্ষপাতিত্বের কল্পনাই অন্তরে স্থান দিবে না, কোন এক দিকে ভক্তির ভাব পোষণ করবে না। কারণ ভক্তির নেশায় তার দোষ চোখে ভাসবে না বরং সব কথাই সুন্দর মনে হবে। তাই সত্য সন্ধানের পন্থা এটা নয়। বরং বিশুদ্ধ মনে উভয় পক্ষের কিতাবাদি পাঠ করাই এর উপায়। আরো মনে রাখতে হবে—ব্যাপারটা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পৃক্ত। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই ঘটনা বিশ্লেষণ করা দরকার। সত্যকে জানার সত্যিকার আগ্রহ বিদ্যমান থাকলে ইনশাআল্লাহ্‌ অন্তরে তা প্রতিভাত হবেই। একজনের হকপন্থী হওয়া প্রমাণ হওয়ার পর তারই সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে এখান থেকেই দীনের কথা এবং খোদার রাহের সন্ধান লাভের চেষ্টা করুন। কিন্তু অন্যজনকে মন্দ বলা থেকে বিরত থাকুন। কারণ নিন্দা চর্চায় আপনার কোন লাভ নেই। তাই নিজের পরিবেশ এভাবে গড়ে তুলুন ঃ

همه شهر پر زخوباں منم و خیال ما هے

چه کنم که چشم بدخونه کند بکس نگا هے

—সারা শহর সুন্দরী-রূপসীতে পরিপূর্ণ, কিন্তু আমি আমার প্রেমাষ্পদের চিন্তায় বিভোর। কি করি, দুষ্ট চোখ যে অন্য কারো প্রতি নযরই তোলে না।

অধিকন্তু কবির ভাষায় ঃ

دل آرا میکه داری دل در و بند

دگر چشم از همه عالم فرو بند

—হে মন! তোমার যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের বাসনা থাকলে জগতের অন্য সবকিছু থেকে বিমুখ হয়ে একমাত্র প্রিয়জনের সাথেই আত্মার বাঁধন সৃষ্টি কর।

আসলে কেউ মন্দ যদি হয়ও তুমি তাকে খারাপ বলতে যেও না। এমনকি তোমার মন্দ চর্চায় লিপ্ত থাকলেও না। কেননা পরের নিন্দা চর্চায় তোমার কি লাভ ? কেউ অপকৃষ্ট হলো, তাতে তোমার ক্ষতি কি ? এ সম্পর্কে মনীষী 'যওক' বলেছেন ঃ হে 'যওক'! তুমি উত্তম হলে অধম কেউ হতে পারে না। মূলত অধম সে-ই, যে তোমায় মন্দ জানে। কিন্তু যদি নিজেই তুমি মন্দ হও, তাহলে তার কথা যথার্থ। তখন তার মন্দ বলায় তোমার অসন্তুষ্টির কি কারণ ?

আলোচ্য নিয়ম শিক্ষিত সমাজের জন্য। কিন্তু যারা শিক্ষা-বঞ্চিত তাদের করণীয় হলো—দুজন আলিমের সাহচর্যে এক এক সপ্তাহ ধরে অবস্থান করবে এবং অবসর সময় জেনে তাদের সান্নিধ্যে বসবে, কথাবার্তা শুনবে আর লক্ষ করে যাবে শরীয়তের সর্বসম্মত মাসআলাসমূহের সার্বক্ষণিক সযত্ন পালনে কে অধিক সতর্ক। দ্বিতীয়ত, কার প্রভাবে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। কোন আলিমের সান্নিধ্যে যাওয়ার পর যদি মনে আখিরাত ও ইবাদতের আগ্রহ বেশি হয়, খোদার নাফরমানীর প্রতি অন্তরে ঘৃণা ও ভয় সৃষ্টি হয় এবং তার সাহচর্যে অবস্থানকারী লোকদের অধিকাংশের সার্বিক অবস্থা উত্তম ও উন্নত মানের হয়, তবে তাঁর সাহচর্যই গ্রহণ করবে। সময় সময় তাঁর নিকট যাওয়া-আসা অব্যাহত রাখবে। এ নিয়ম শিক্ষিত লোকদের জন্যও উপকারী। সান্নিধ্যে অবস্থান দ্বারা কারো আভ্যন্তরীণ প্রকৃত অবস্থা যতটুকু জানা যায় কেবল কিতাব পাঠ করে কোন আলিমের আসল রূপ ততটুকু জ্ঞাত হওয়া যায় না। কাজেই শিক্ষিতদের পক্ষেও আলোচ্য উপায় অবলম্বন করাটা অধিক উত্তম।

—আসবাবুল ফিতনাহ্‌, পৃষ্ঠা ৫৭

৭৮. "রোযা মাত্র তিনটি হওয়া উচিত" মন্তব্যের জবাব।

সম্প্রতি একটি প্রচারপত্র নিজের চোখে এইমর্মে প্রচারিত হতে দেখলাম যে, রোযা মাত্র এগার, বার ও তের (১১, ১২ ও ১৩) এই তিন দিন হওয়া বাঞ্ছনীয়। এখন এর সপক্ষে প্রবক্তাদের পেশকৃত চমৎকার দলীলও শুনুন। এ পর্যায়ে কুরআনে বর্ণিত ایاما معدودات (নির্দিষ্ট কয়েক দিন) আয়াতাংশ মূলত তাদের দলীলের ভিত্তি। অথচ আয়াতের আসল মর্ম হলো—রোযার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমাদের উৎসাহ দান এবং সাহস বৃদ্ধিকল্পে বলা হয়েছে ঃ তোমাদের আতংকের কি আছে, রোযা তো মাত্র কয়েক দিনের ব্যাপার। কিন্তু একে তারা হজ্জ সম্পর্কিত ایاما معدودات অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের এগার, বার ও তের তারিখের ওপর ইজতিহাদ করে মাসআলা উদ্ভাবন করে নিয়েছে যে, রোযার ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য। কেননা কুরআনের এক অংশ অপর অংশের ব্যাখ্যাকারী। কিন্তু তারা ভাবেনি যে, কুরআনের এক আয়াত অপর আয়াতের তাফসীর করে বটে কিন্তু কখন ? এ অর্থ সে ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেখানে এক আয়াতের তাফসীর তো নির্দিষ্টভাবে জানা কিন্তু অপর আয়াতের তাফসীর অজ্ঞাত। অথচ এখানে উভয় আয়াতের তাফসীর পৃথক পৃথক রূপে বর্ণিত ও জ্ঞাত। কিন্তু জ্ঞানান্ধরা এক স্থানের তাফসীর গ্রহণ করে অন্য আয়াতের তাফসীর উপেক্ষা করে গেছে। আমি বলব— ایاما معدودات দ্বারা দ্বিতীয় আয়াতের ন্যায় এখানেও ১১, ১২ ও ১৩ অর্থ গ্রহণ করা হলে সে তো যিলহজ্জ মাসের তারিখ হবে।

ফলে যিলহজ্জের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ রোযা রাখা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত সাব্যস্ত হবে। অথচ এ কয়দিন আইয়ামে তাশরীক, যাতে রোযা পালন সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। সুতরাং এখন ফল এই হলো যে, কুরআন দ্বারা এমন দিনে রোযা রাখা ফরয যেদিনের রোযা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। কি চমৎকার ইজতিহাদ। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো— ایاما معدودات -এর অর্থ সবখানেই যদি একই ১১, ১২ ও ১৩ হয় তবে ইহুদিদের দাবি لن تمسنا النار الا ایاما معدودات (যে মাত্র কয়েকদিনই আমাদেরকে জাহান্নামবাসী হতে হবে) এর অর্থও কি উক্ত তিন দিনই হবে ? কেউ কি ঈমানদারীর সাথে বলতে পারে যে, ইহুদিদের উদ্দেশ্যও যিলহজ্জ মাসের উক্ত তারিখই এবং এ কয়দিনই তাদেরকে জাহান্নামে থাকতে হবে ? এখানেও যদি অর্থ এ-ই হয়, তাহলে কথাটা এমন হলো যে—"যে কালা সেই আমার বাপের শালা।" মোটকথা—এমনিভাবে মানুষ নানান ফিতনা সৃষ্টি করে নিয়েছে, ইসলামী হুকুমত ব্যতীত এসবের নির্মূল-নিধন আর কত করা যায়। ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষেই কেবল এসবের উৎখাত সম্ভব। —আজরুস্‌সিয়াম মিন গাইরি ইনসিরাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯

৭৯. অসুবিধার দরুন তাবলীগের দায়িত্ব রহিত হয় কি-না, এ সন্দেহের জবাব।

এর জবাব হলো—প্রথমে সৎকাজের আদেশ এবং তাবলীগের কাজ আপনারা শুরু করুন, এরপর দেখুন গাড়ি কোথায় আটকে, ফতোয়া জিজ্ঞেস করবেন তখন। আগেই ওযরের মাসআলা জিজ্ঞেস করার অর্থ—জান বাঁচানোর বাহানা তালাশ করা। সে অধিকার আপনার কোথায় ? শক্তির বাইরে শরীয়তের হুকুম নেই, মুসলমান মাত্রেরই তা জানা। আর অন্যান্য ব্যাপারে এ ধরনের ওযর-আপত্তি কেউ উত্থাপনও করে না। যেমন—সময়ে বিশেষ ওযরের কারণে অযূ করা এবং দাঁড়িয়ে নামাযের মধ্যে দাঁড়ানোর হুকুম রহিত হয়ে যায়। কিন্তু কাউকে যখন নামাযের কথা বলা হয় সে তখন এ প্রশ্ন তোলে না যে, প্রথমে বলুন—কি কি কারণে অযূ এবং কিয়াম রহিত হয় ? কেননা নামায পড়া সবাই জরুরী আর ওযরকে সাময়িক মনে করে। তদ্রূপ খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও কেউ বলে না—হাকিম সাহেব, খাওয়ার শর্ত কি এবং কখন ত্যাগ করতে হবে আগে বলুন। কারণ সবাই জানে—খাদ্য অপরিহার্য আর ত্যাগ করাটা সাময়িক ব্যাপার। একইভাবে রমযানের রোযা, যারা মনে করে রমযান মাসে রোযা রাখা অপরিহার্য তাদের প্রশ্ন কখনো এরূপ হয় না—মাওলানা সাহেব বলে দিন কি কি কারণে রমযানের রোযা রহিত হয়ে যায়। বরং এ জাতীয় প্রশ্নকর্তাকে বে-রোযার দলে গণ্য করা হয়।

অতএব জনাব, আপনার কর্তব্য ছিল সৎকাজের আদেশ দানের কাজ প্রথমে শুরু করে দেয়া। অতঃপর কোন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে উপদেশ দানে অথবা কাফিরকে দীনের তাবলীগ করার ব্যাপারে কোথাও আটকে গেলে তখন মাওলানা সাহেবকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, হুযূর এখন কি করা ? আপনারা শাসক-শাসিত, মুসলমান-কাফির, স্ত্রী-সন্তানকে সৎকাজের আদেশ দানের আগেই শুরু করলেন ওযরের মাসআলা জানতে। আপনারা হয় তো বলতে পারেন—নামায-রোযার ওযর অপেক্ষা সৎকাজের আদেশ দানে বাধার পরিমাণের হার অধিক। আমি বলি—এটা ভুল কথা। পরিবারের লোকদের সৎকাজের আদেশ দানে, বে-নামাযী স্ত্রীকে উপদেশ দানে ও শাসন করাতে ভয় কিসের ? সে কি আপনাকে মেরে ফেলবে ? বে-নামাযী ছেলেকে শাসন করলে আপনার কি ক্ষতি হবে ? যদি আপনি বলেন—সে অবাধ্য, কথা শোনে না। তাহলে আমি বলব—ছেলে পরীক্ষায় ফেল করলে তার ওপর কেন আপনার শাসনের মার পড়ে, তখন সে আপনার কথা কিরূপে শোনে ? তাই বোঝা গেল —এ সবই টালবাহানা মাত্র। আসল কথা হলো—এটাকে আপনি অপরিহার্য মনেই করেন না। আপনার কোন প্রিয়জন চোখের সামনে বিষপানে উদ্যত হলে আপনার করণীয় কি হবে, আপনি কি তাকে বিরত রাখবেন না ? এ ক্ষেত্রে তো আপনি বলপূর্বক তার হাত থেকে বিষের পাত্র ছিনিয়ে নেবেন, একা সম্ভব না হলে অবশ্যই সহায়ক জোটাবেন। তাহলে দীনের ব্যাপারে ক্ষতিকর বিষয় থেকে রক্ষার এ পরিমাণ যত্ন কেন হয় না ? বোঝা গেল—দীনের ক্ষতি আপনাদের নযরে গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটা একটা প্রতিকারবিহীন মারাত্মক ব্যাধি। ব্যক্তি বিশেষ ছাড়া সবাই এত উদাসীন যে, চিকিৎসার প্রতি কারো মনোযোগ নেই।

—তাওয়াসী বিল-হক, ১ম খণ্ড

৮০. তাবলীগের সহজ পন্থা।

নির্দিষ্ট নাম-ধাম ছাড়া দীন প্রচারের উদ্দেশ্যে জিলায় জিলায় তাবলীগী জামাত প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য, এমনকি দায়িত্বশীলদের নাম পর্যন্ত প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন। কেননা আজকাল সভা-সমিতির নিয়মনীতি এবং দায়িত্বশীলদের ফিরিস্তিতে রেজিস্টার খাতা বোঝাই করা হয়, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। অথচ আমরা চাই যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী বাস্তব ক্ষেত্রে কাজ হোক। বিরাট পরিকল্পনার কথা চিন্তা না করে প্রথমে ছোট আকারেই কাজ শুরু করুন। আমাদের অবস্থা হলো—কাজ করি তো অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে করি নতুবা একেবারেই করি না। ভাবখানা এই—"খাব তো ঘিয়ে-ভাতে—যাব তো মনের স্রোতে।" এটা বড়ই বোকামি।

স্মরণ থাকা দরকার, যে কোন কাজের সূচনা হয় ক্ষুদ্র বিন্দু থেকে, ক্রমান্বয়ে তা বেড়ে ওঠে। এ পার্থিব জগতে আল্লাহ্ তাঁর কাজের গতি ধীরে এবং ক্ষুদ্র আকারে প্রকাশ করেছেন। মানব অস্তিত্বের সূচনায় এক বিন্দু পানি, পরে দীর্ঘ নয় মাসে তার জন্ম, অতঃপর লালন-পালন ও বিকাশের ক্রমধারায় পনর বছর বয়সে তার যৌবনে পদার্পণ। অথচ মহান আল্লাহ্ জান্নাতের ন্যায় দুনিয়াতেও মুহূর্তের ব্যবধানে সবকিছু সম্পন্ন করতে সক্ষম। যেমন—জান্নাতে কারো সন্তানের কামনা হবে আর স্ত্রীর সাথে মিলন-মুহূর্তেই স্ত্রী গর্ভধারণ করবে এবং তৎক্ষণাৎ সন্তানের জন্ম হবে। এমনকি একই সময় ছেলে পিতার সমপর্যায়ে বেড়ে উঠবে। আল্লাহ্ কর্তৃক সে দৃষ্টান্ত এখানে স্থাপিত না হয়ে ধীরে ক্রমান্বয়ে তাঁর কর্মনীতির প্রকাশ আমাদের শিক্ষার জন্যই তো যে, কর্মের সূচনাতেই তোমরা সমাপ্তির ধারণা পোষণ করো না। বরং সূচনা কর তোমরা ক্ষুদ্র আকারে এবং যত্ন পরিচর্যায় লেগে থাক। ধীরে ধীরে একদিন তা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হবে। সামর্থ্যানুযায়ী কাজ করার জন্যই তোমরা আদিষ্ট, এর অধিক নয়। এতেই আল্লাহ্ বরকত দিবেন। সাড়ম্বরে সমিতির নাম দিয়ে কর্মকর্তা নিয়োগ দ্বারা নিট ফল কিছুই আসে না। বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে এবং পত্র-পত্রিকায় নাম তুলে প্রচারণা দ্বারা তেমন লাভ হয় না। মূলত কর্মই কল্যাণ বয়ে আনে যদি তা অল্পও হয়। অতএব, নিজেদের সংখ্যাল্পতার প্রতি লক্ষ না করে দু-চারজন মিলেই তাবলীগ শুরু করুন। মহান আল্লাহ্ মাত্র একক ব্যক্তিত্বের কল্যাণে সাড়া বিশ্বে ইসলাম পৌঁছিয়েছেন। সে একই আল্লাহ্ এখনো বর্তমান। তাঁরই ওপর ভরসা করে কাজ শুরু করে দিন। এ পর্যায়ে আল্লাহ্ কুরআন পাকে সাহাবীগণের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন ঃ

كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ فَـاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰـى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الـزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ -

—তাদের দৃষ্টান্ত যমীনে প্রোথিত বীজের ন্যায়, যা থেকে অংকুরোদগম হয়, অতঃপর আলো-বাতাসের পরশে তা শক্ত ও পরিপুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের ওপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায় যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ্ মু'মিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন।

অতএব, ক্ষুদ্র দানা থেকে উদ্গত চারাগাছ পাড়া জুড়ে ছায়া বিস্তারকারী প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হতে আপনারা লক্ষ করেছেন। উদ্ভিদের সামান্যতম বীজের অবস্থা যদি এই হয়, তাহলে আল্লাহ্র ওপর ভরসা করে মুষ্টিমেয় দু-এক ব্যক্তির পদক্ষেপ দ্বারা তাদের কাজের অগ্রগতি ও উন্নতি বিচিত্র কি। কিন্তু আজকাল মুশকিল হলো—কোন

কাজ শুরু করার পূর্বেই বিবৃতি ছাপার উদ্দেশ্যে পত্রিকা অফিসে ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায়, শুরু হয় বিজ্ঞাপন ছাড়ার পালা। ভাইগণ! এটা 'রিয়া' (লোক দেখানো) নয় কি, আর তা কি নিষিদ্ধ নয় ? এ হুকুম কার জন্য, কাফেরের প্রতি ? আদৌ না। মুসলমানদেরকেই বরং 'রিয়া' ইত্যাদি থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা কাফেররা মূল বিষয় ঈমান গ্রহণে আদিষ্ট, আনুষঙ্গিক (فروع) বিষয়ে নহে। এ প্রসঙ্গে কারো কারো মন্তব্য—অন্যদের উৎসাহের জন্য আমরা প্রচারের পক্ষপাতী, নিজেদের সুনামের জন্য নয়। আমি বলব—জনাব থামুন, এটা বাক-চাতুরী ও অপব্যাখ্যা বৈ অন্য কিছুই নয়। নিজের অন্তর হাতিয়ে দেখুন সুনাম-সুখ্যাতির অদম্য আগ্রহ ব্যতীত অন্য কিছুই সেখানে পাওয়া যাবে না। বাস্তবিক যদি কারো উদ্দেশ্য অপরকে উৎসাহ দান করা হয়ে থাকে, তা সত্ত্বেও এর প্রচারণার পূর্বে কোন বিজ্ঞ আলিমের পরামর্শ জেনে নেয়া উচিত। —তাওয়াসী-বিল হক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০

৮১. মুজতাহিদগণের মতবিরোধের প্রকৃত কারণ।

একাধিক সুন্নতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মূল উদ্দেশ্য কোন্‌টি এবং কোন্‌টি আনুষঙ্গিক তা চিহ্নিত করাই মুজতাহিদগণের কাজ। যে কেউ এ কাজের যোগ্য নয়। এ ইজতিহাদ-কাজে সময়ে মতবিরোধও ঘটে যায়। যেমন নামাযের মধ্যে "রাফয়ে ইয়াদাইন" (হাত ওঠানো) করা এবং না করা উভয় প্রকার রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে প্রমাণিত। তাই এ বিষয়ে মুজতাহিদগণের মতবিরোধ হয়ে যায়। একজন মনে করেন, "রাফয়ে ইয়াদাইন" করা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মূল উদ্দেশ্য আর 'রাফয়ে ইয়াদাইন' না করা উদ্দেশ্য নয় বরং কেবল বৈধতা প্রমাণ করাই লক্ষ্য। অপরপক্ষে 'রাফয়ে ইয়াদাইন' যারা সমর্থন করেন না তাঁদের বক্তব্য হলো—নামাযের মধ্যে মনের একাগ্রতা অপরিহার্য। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীগণকে লক্ষ করে বলেছেন ঃ "তোমাদের কি হলো যে, নামাযের মধ্যে তোমরা হাত ওঠাও। নামাযে তোমরা একাগ্রতা অবলম্বন কর।" সুতরাং এর দ্বারা বোঝা গেল হাত না ওঠানো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্দেশ্য। অবশ্য সময়ে উঠিয়েছেন বৈধতা প্রমাণের জন্যে মূল উদ্দেশ্য হিসেবে নয়। যারা হাত ওঠানো মূল ওদ্দেশ্য মনে করেন এ সম্পর্কে তাদের বক্তব্য এই যে, নিষিদ্ধ 'রাফয়ে ইয়াদাইন' (হাত ওঠানো) সেটা নয় যা রুকূতে যাওয়া ও ওঠার সময় করা হয় বরং তা হলো—সালাম ফিরানোর সময় যে 'রাফয়ে ইয়াদাইন' করা হয়। কোন কোন হাদীসে এর ব্যাখ্যা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবীগণ নামাযের সালাম ফিরানোকালে হাত তুলে বলতেন—আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ সালামকে নিষেধ করেছেন।

আমাদের পক্ষ থেকে এর জবাবে বলা হয়—বেশ, স্বীকার করলাম 'রাফয়ে ইয়াদাইন' দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। কিন্তু এতে একথা অবশ্যই প্রমাণ হয় যে, নামাযের মধ্যে একাগ্রতাই আসল কাম্য আর রফা (হাত ওঠানো) এর পরিপন্থী। অতএব, বিতর্কিত স্থানেও রফা মাকসূদ নহে। কেননা তা নামাযের আসল অবস্থা অর্থাৎ একাগ্রতা বিরোধী। পক্ষান্তরে হাত না ওঠানো একাগ্রতার অনুকূল বিধায় তা মাকসূদ ও কাম্য একইভাবে অন্য যেসব ক্ষেত্রে বিরোধ দেখা দিয়েছে তার কারণ এই ছিল যে, একজন এক বিষয়কে মাকসূদ মনে করেছেন অপর জন অন্য বিষয়কে। যেমন—আমীন বলা। কোন মুজতাহিদের মতে সূরা ফাতিহার শেষে আমীন জোরে বলাটা শরীয়তের কাম্য কিন্তু আস্তে বলার উদ্দেশ্য বৈধতা নির্দেশকল্পে। অন্যদের অভিমত—কাম্য আস্তে বলাই। কারণ এটা দোয়া বিশেষ। আর দোয়া আস্তে করাই যুক্তিযুক্ত। কখনো উচ্চকণ্ঠে বলার অর্থ জানিয়ে দেয়া যে, আমীনও বলা হচ্ছে। অন্যথায় জানাই যেত না আপনি কখনো আমীন বলছেন কি-না। যেরূপ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনো কখনো 'সিররী' (অনুচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ) নামাযের মধ্যে উম্মতের শিক্ষার উদ্দেশ্যে আয়াত বিশেষ উচ্চকণ্ঠে পাঠ করে দিতেন। শরীয়তের উদ্দেশ্য নির্ণয়ে মুজতাহিদগণের কেউ এটাকে লক্ষ্য স্থির করেছেন, কেউ ওটাকে। কাজেই মতবিরোধ দেখা দেয়। বস্তুত বিষয়টিকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হলে পারস্পরিক ঝগড়ার কারণ খতম হয়ে যায়। এই হলে মতভেদের মূল কারণ যার ভিত্তিতে সর্বত্র মতবিরোধ দেখা দেয়।

—আহকামুল মাল, পৃষ্ঠা ৩৩

৮২. দরূদে ইবরাহীমী উত্তম হওয়া সন্দেহের জবাব।

প্রশ্ন উঠেছে—

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم —

দরূদে মহানবী (সা)-এর দরূদকে ইবরাহীম (আ)-এর দরূদের সাথে তুলনা দেয়া হয়েছে। এতে কারো কারো মনে প্রশ্ন জাগে—মুহাম্মদ (সা)-এর দরূদ অপেক্ষা ইবরাহীম (আ)-এর দরূদ উত্তম ও পরিপূর্ণ হওয়ার। এর উৎস হলো—মানুষের প্রচলিত ধারণা যে, তাশবীহের (তুলনা দেয়া) ক্ষেত্রে তুল্য বিষয় অপেক্ষা তুলনীয় বিষয়টি উত্তম ও শক্তিশালী হওয়া শর্ত। অথচ মূল ভূমিকাটিই ভুল। এ ক্ষেত্রে বরং কেবল স্পষ্ট ও প্রচলন-সমৃদ্ধ হওয়াই জরুরী, উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ হওয়া অপরিহার্য নয়। স্বয়ং কুরআনে এর প্রমাণ বিদ্যমান। বলা হয়েছে ঃ

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ —

—"আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার, যার মধ্যে রয়েছে একটি দীপ।"

এতে আল্লাহ্ আপন জ্যোতিকে প্রদীপের আলোর সাথে তুলনা করেছেন। অথচ নূরে রব্বানীর সাথে প্রদীপ-আলোর কোন সম্পর্ক কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও দীপের আলো মানব কল্পনায় বিরাজমান ও স্পষ্ট থাকার দরুন তার সাথে আল্লাহ্র জ্যোতির তুলনা দেয়া হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে—চন্দ্র-সূর্যের আলোও তো মানব চিন্তায় বিদ্যমান এবং দীপের আলো অপেক্ষা উজ্জ্বলতর, তাহলে এ-দুয়ের সাথে তুলনা না দেয়ার হেতু কি ? উত্তর এই যে, দীপ অপেক্ষা চাঁদ-সুরুজের আলো উজ্জ্বল, কিন্তু উভয়টির মধ্যে এক প্রকার ত্রুটি রয়েছে। সূর্য-কিরণের ত্রুটি হলো—এতে দৃষ্টির স্থিতি আসে না। তাই সূর্যের আলোর সাথে তুলনা করা হলে শ্রোতার মনে সন্দেহ জাগা বিচিত্র নয় যে, আল্লাহ্র নূর সম্ভবত এ ধরনেরই যে, এতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা দায় হবে। ফলে জান্নাতে আল্লাহ্র দীদার (দর্শন) সম্পর্কে নৈরাশ্য সৃষ্টি হওয়ার আশংকা সৃষ্টি হয়। আর চাঁদের আলোর সাথে তুলনা না করার কারণ শ্রুতি রয়েছে যে, চাঁদের আলো সূর্যের আলো থেকে প্রতিফলিত। কাজেই তার সাথে তুলনা করায় সন্দেহ রয়েছে—খোদায়ী জ্যোতিও বোধ হয় কারো থেকে প্রাপ্ত। উপরন্তু চন্দ্র-সূর্য অপেক্ষা প্রদীপের অতিরিক্ত একটি বৈশিষ্ট্য হলো, অপরকেও সে জ্যোতির্ময় করে দেয়। ঘণ্টায় লাখো দীপে যে অগ্নি সংযোগ করে তাকেও সে সমশক্তিতে রূপান্তরিত করে দেয় কিন্তু তার আলোতে কোন প্রকার কমতি আসে না। অথচ চন্দ্র-সূর্য নিজ নিজ আলোয় আলোকিত, অপরকেও আলোর ভুবনে উজ্জ্বল করে দিতে সক্ষম কিন্তু কারো মধ্যে আলোক সঞ্চার দ্বারা আলোকাধারে রূপান্তরিত করা সম্ভব নয়। যদি বলা হয়—চন্দ্র কিংবা সূর্য কিরণের মুখোমুখি আয়না রাখা হলে সে নিজে আলোকোজ্জ্বল হয়ে প্রাচীর পর্যন্ত আলোকিত করে দেয়। এর জবাব হলো—আয়না উদ্ভাসন ও আলোক প্রতিফলনের মাধ্যম মাত্র। আধার নয়। অথচ দীপ আলোর আধার রূপে গণ্য, খোদাই নূর যেরূপ স্থিতিশীল মাধ্যম। কিন্তু এ সামঞ্জস্য সার্বিকভাবে প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ্ না করুন, এর দ্বারা কেউ যেন অন্য খোদা বানিয়ে না নেয়।

মোটকথা, এ ক্ষেত্রে মূল কথা —নূরে রব্বানী নিজে জ্যোতির্ময় হওয়ার সাথে অপরকেও আলোকাধার বানিয়ে দিতে সক্ষম, যদিও উভয় কিরণে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান। আর এ বৈশিষ্ট্য প্রদীপেও বিদ্যমান, চাঁদ ও সূর্যে নয়। এসব হলো আনুষঙ্গিক রহস্য কথা, মূল উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং প্রত্যেক বিষয়কে তার নিজস্ব প্রেক্ষিতে বিচার-বিশ্লেষণ করা বাঞ্ছনীয়।

৮৩. আল্লাহ্র কাছে পৌঁছার ব্যাপারে সংশয়।

কারো মনে সন্দেহ জাগা বিচিত্র নয় যে, আল্লাহ্র দরবার ও নৈকট্য সীমাহীন, যথা মাওলানা রূমীর ভাষায় ঃ

ائے برادر بے نہایت در گہیست
هرچه بروے میوسی بورئے مائیست

—ভ্রাতঃ আদিগন্ত বিস্তৃত সীমাহীন এ দরবার, নিঃসীম তাঁর সদন-সান্নিধ্য, চলা শেষে উপনীত তুমি যেখানে হবে তার পরও আমিই আমি (অর্থাৎ আল্লাহ্ই আল্লাহ্)।

অপর এক প্রেম-বিদগ্ধ আরেফ বলেছেন ঃ

نگردد قطع هرگز جاده عشق از دویدنها
که می بالد بخودایں راه چوں تاك از بریدنها

—প্রেমের সূক্ষ্ম পথ দৌড়ে অতিক্রম করা সম্ভব নয়, যতই কাটা হোক আঙ্গুর লতার ডগার ন্যায় আপনা থেকে তা বাড়তেই থাকে (অর্থাৎ প্রেমের পথও তদ্রূপ দীর্ঘায়িত হতে থাকে)।

সুতরাং এ পথের যেহেতু কোন সীমা নেই, প্রান্ত নেই, তাই তাঁর সান্নিধ্যে পৌঁছার কি উদ্দেশ্য ? কেননা চলমান ক্রিয়া একটা সীমিত বিষয়, যা অসীমের পথে কতই বা এগুতে পারে ? এর জবাব হলো —'পৌঁছা' (وصول) দুই প্রকার। (১) সীমিত ও (২) সীমাহীন। অর্থাৎ আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক (تعلق مع الله) দুই স্তর বিশিষ্ট। (১) سير الى الله —আল্লাহ্র দিকে অগ্রসর হওয়া যা সীমিত এবং (২) سير فى الله —আল্লাহ্র উদ্দেশে ভ্রমণ। এটা সীমাহীন। অতঃপর "সায়র ইলাল্লাহ"র মর্ম এই যে, রূহানী চিকিৎসার মাধ্যমে নফসের (অন্তর) রোগ নিরাময়ের পর আল্লাহ্র যিক্র-শোগল বা ধ্যান-ধারণা দ্বারা অন্তরের পুনর্গঠন শুরু হয়ে যাওয়া। এমন কি এখন তা যিক্রের নূরে পরিপূর্ণ এবং গাইরুল্লাহ্ থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ্তে আত্মনিবেদনের নিয়ম-নীতি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। সকল অন্তরায় বিদূরিত, আত্ম-ব্যাধির চিকিৎসা সম্পর্কে অবগত আর আত্মশুদ্ধি পূর্ণতা লাভ করে কলুষিত চরিত্র দূরীভূত হয়ে গেছে। উপরন্তু অন্তর এখন পরিমার্জিত ও যিক্রের নূরে অলংকৃত, সৎকর্মের আগ্রহ চরিত্রের অঙ্গে পরিণত এবং আমল-ইবাদত সহজতর আর আল্লাহ্র সম্পর্ক এখন ঘনিষ্ঠতর সুতরাং সায়ের ইলাল্লাহর সমাপ্তি ঘটেছে। এরপর শুরু হয় "সায়র ফিল্লার" পর্যায়। এ পরিমণ্ডলে ব্যক্তির যোগ্যতানুসারে আল্লাহ্র যাত (সত্তা) ও

সিফাত (গুণাবলী) আবরণমুক্ত হতে থাকে। আর পূর্ব সম্পর্কের উন্নতি এবং রহস্য ও তত্ত্বপূর্ণ অবস্থার অব্যাহত বিকাশ শুরু হয়। বস্তুত এ পর্যায় সীমাহীন। আল্লাহ্র সাথে সৃষ্ট এ 'সম্পর্ক' লক্ষ করেই বলা হয়েছে ঃ

بحریست بحر عشق که هیچش کناره نیست
آنجا جز اینکه جان بسپارند چاره نیست

—প্রেমের সাগর মূলত এক অকূল সমুদ্র, এ জগতে আত্মসমর্পণ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন উপায় নেই।

এর উপমা—এক ব্যক্তি বিজ্ঞান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সনদপত্র লাভ করল। অতএব তার যেন "সায়র ইলাল্লাহ্" (আল্লাহ্র দিকে পথ চলা) সমাপ্ত হলো। অতঃপর শুরু হলো তার বিজ্ঞান বিচরণ। অর্থাৎ বিজ্ঞান গবেষণায় আত্মনিয়োগের ফলে নতুন নতুন আবিষ্কারের দ্বার উন্মুক্ত হওয়া। এর কোন সীমা নেই, অনন্ত এ জগত। সুতরাং বিজ্ঞানীরা একমত যে, বিজ্ঞান গবেষণার ক্রমধারা অসীম—অকূল।

সুতরাং পার্থিব কোন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্টতার অবস্থা যদি এই হতে পারে, তাহলে মহান আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কের تعلق مع الله অবস্থা কি হবে ? অপর একটি উপমা লক্ষ করুন—মনে করুন কোন একটি গোলক স্বীয় কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর গতি সঞ্চয় করে আপন বিন্দুতে পৌঁছে গেলে তার কেন্দ্রমুখী বিচরণ সমাপ্ত হলো। অতঃপর কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থানকালে তার যে অব্যাহত প্রাকৃতিক গতি শুরু হয় এর কোন সীমা নেই, সমাপ্তি নেই। অতএব আলোচ্য—"আল্লাহ্র দিকে পথচলা" এবং "আল্লাহ্তে বিচরণ" বিষয়টিকেও একই রকম মনে করুন। এ আলোচনার প্রেক্ষিতে "আল্লাহ্র মহান দরবার অসীম, অকূল, তাই এতে পৌঁছার অর্থ কি ?" এ সন্দেহ তিরোহিত হয়ে যায়। ইতিপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি যে, সায়র ইলাল্লাহ্ (আল্লাহ্র দিকে পথ চলা) অর্থে "তা'আল্লুক মা'আল্লাহ্" (আল্লাহ্র সম্পর্ক) সীমিত ও গণ্ডিভূত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ স্তরে পৌঁছলেই শিষ্য খিলাফত এবং বায়'আত গ্রহণ করার অনুমতি প্রাপ্ত হয়। শিক্ষাসূচির নির্দিষ্ট একটি পর্যায় অতিক্রম ও উত্তীর্ণ হওয়ার পর যেরূপ সনদ দেয়া হয়। আর এটা একটা সীমিত ও সমাপনযোগ্য স্তর। অতঃপর আজীবন চর্চা দ্বারা জ্ঞানের ক্রমবিকাশ ও উন্নতি ঘটতে থাকে, যা সীমাহীন, সমাপ্তিহীন এবং উন্নতির অন্তহীন এক ক্রমধারা। অতএব, আল্লাহ্র সম্পর্ক ও সান্নিধ্যের প্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করা হলে অসীম ও সসীম উভয় প্রকার বিশুদ্ধ।

—গায়াতুন্নাজাহ, পৃষ্ঠা ৩৮

৮৪. আমল ছাড়া কারো কারো কামিল হওয়ার ভ্রান্তিপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা।

দীনের ব্যাপারে মানুষ চায় আল্লাহ্‌র সাথে এমনি গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠুক এবং প্রেম ভালবাসা এত তীব্রতা লাভ করুক যে, রোযা-নামায ইত্যাদি আল্লাহ্‌র হক যেন নিজে নিজে আদায় হয়ে যায়, আমাদের কিছুই করা না লাগে। কিন্তু এ অবস্থা মানুষের ইখতিয়ার বহির্ভূত, এতে বান্দার কোন হাত নেই। বস্তুত মানুষের কর্তব্য হলো—নিজের ইচ্ছাশক্তির বাস্তব প্রয়োগ ঘটানো এবং ইখতিয়ার বহির্ভূত বিষয়ের পিছনে না পড়া। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হাদীসে বর্ণিত الطهر وهو شطر الايمان (পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক)-এর ন্যায় উক্ত বিষয়টিকে আমি 'সুলুকের' (আধ্যাত্মিকতার) অর্ধাংশ মনে করি যে, ইচ্ছাধীন বিষয়ে ত্রুটি না করা আর ইখতিয়ার বহির্ভূত বিষয়ের পিছনে লেগে না থাকা। আজকাল কেবল নামায-রোযাকেই মানুষ দীনরূপে গণ্য করে। অথচ এসব আমল দীনের অংশ মাত্র, এটুকুই পূর্ণাঙ্গ দীন নয়। স্মরণ রাখা দরকার—অনিচ্ছাধীন বিষয় অর্থাৎ 'হালাত' ও 'কাইফিয়াত' (বিশেষ আধ্যাত্মিক অবস্থা) কদাচিৎ যদি হাসিল হয়ও, তবে তা ইচ্ছাধীন আমলে লিপ্ত হওয়া দ্বারাই হয়। কিন্তু শর্ত হলো—অনিচ্ছাধীন বিষয় লাভের নিয়ত পর্যন্ত করা উচিত নয়। কেননা ফল লাভে বিলম্ব কিংবা অবিলম্ব ইচ্ছার বাইরের বিষয়। কখনো আমলের ত্রুটির দরুন বিলম্ব ঘটে, কখনো বান্দার দুর্বলতা ও অযোগ্যতার কারণে। কাজেই আমলের প্রতিফল লাভে নিজে সচেষ্ট না হয়ে বরং আল্লাহ্‌র হাওয়ালায় ন্যস্ত করে দেয়াই সমীচীন। বরং নিজেদের ক্ষমতাধীন বিষয়ের আমলে তোমরা যত্নবান হও। কবির ভাষায় ঃ

تو بندگی چو گدایاں بشرط مزد مکن
که خواجه خود روش بنده پروری داند

—মজদুরের ন্যায় মজদুরীর শর্তে তুমি ইবাদত-বন্দেগী করো না, কেননা মনিবের নিজেরই জানা আছে তার গোলামের লালন-পদ্ধতি কি হবে।

অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র নিজেরই জানা আছে তোমাদের পক্ষে কোন্‌টা সমীচীন আর কোন্‌টা অসমীচীন। কাজেই তোমার যোগ্যতাদৃষ্টে উপযোগী বিবেচিত হয় তো দান করবেন অন্যথায় বিপরীত ব্যবস্থা নিবেন। লক্ষণীয়, সন্তানের কল্যাণ বিবেচনা করেই মায়ের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গৃহীত হয় বাচ্চার আগ্রহ অনুসারে নয়। বিশেষত পিতা কখনো সন্তানের জিদে প্রভাবিত হয় না। অবশ্য মা কখনো ছেলের আবদারে বিগলিত হয়ে পড়ে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পিতা-মাতা নিজেদের বিবেচনা

অনুসারেই সন্তানের পক্ষে কল্যাণকর ব্যবস্থাই নিয়ে থাকে, সন্তানের আবদার-আবেদন যাই থাকুক। মাওলানা রূমীর ভাষায় ঃ

طفل می لرزد زنیش احتجام
مادر مشفق از اں غم شاد کام

—হাজামের সিংগার খোঁচার ভয়ে সন্তান তো থরথরিয়ে কাঁপে আর চিৎকার করে কিন্তু দয়ালু মা খুশী মনে বাচ্চার সিংগা লাগিয়ে দেয়।

কারণ মায়ের দৃষ্টি সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি। সুতরাং মাতা-পিতাও যেখানে সন্তানের মতে ব্যবস্থা নিতে রাযী নয়, সেক্ষেত্রে বান্দার মতানুসারে এবং তোমাদের পরামর্শানুযায়ী কাজ করা আল্লাহ্‌র কি দরকার ? বস্তুত আল্লাহ্‌র সেখানে তাঁর মহান ব্যক্তিত্ব এবং সত্তাগত মর্যাদার প্রশ্ন—গণপরিষদের ব্যাপার নয় যে, বান্দার ইচ্ছায় তাঁকে ব্যবস্থা নিতে হবে। মোটকথা, ইচ্ছাধীন আমলের ক্ষেত্রেও ইচ্ছাশক্তির বাইরের বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা সঙ্গত নয়। নিজের ক্ষমতা নেই এমন বিষয়ের প্রতি তাকানোই উচিত নয়। নিজের কর্তব্য কাজে ব্যাপৃত থাকা বাঞ্ছনীয়।

—রফউল ইলতিবাস আন্ নাফ্ঈল্ লিবাস, পৃষ্ঠা ৫

৮৫. বুযুর্গদের সংস্কার-নীতি সম্পর্কে সন্দেহের জবাব।

কারো কারো মতে সংশোধনের নীতি গ্রহণ করা হলে ভক্ত-মুরীদের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে যাবে। আমি বলব—প্রথমত এ ধারণাই ভুল। দৃশ্যত তোমাদের নিকট লোক সমাগম কম হতে পারে কিন্তু আন্তরিক ও একনিষ্ঠ ভক্তের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যাবে। আচ্ছা বেশ, মেনে নাও মুরীদ কমই হলো তাতে অসুবিধার কি ? মুরীদের দলে সৈন্য ভর্তি করে কি তোমরা কোথাও অভিযানে পাঠাবে ? আর ভক্তের সংখ্যা যদি বাড়েই কিন্তু আশানুরূপ কাজ না হয় তাহলে এদের নিয়ে করবে কি ? মুরীদ ভক্ত অল্প হোক আর বাঞ্ছিত ফল ফলুক এতেই বরং শান্তি। কেননা লোকের ভিড়ে অযথা সময় নষ্ট হয়।

অন্যদের মনের আবেগের প্রেক্ষিতে নরম সুরে উপরোক্ত মন্তব্য করা হলো। নতুবা আমার ব্যক্তিগত রুচিমতে মানুষের অতিরিক্ত ভক্তি-শ্রদ্ধায় আমি শংকিত। কিন্তু লোক সমাগম যাদের পসন্দ, চারপাশে সর্বদা গণবেষ্টনী যাদের কাম্য, ভক্ত-মুরীদের সংখ্যাল্পতায় অবশ্যই তারা আতংকিত হবে এবং সংশোধনের পথ তারা এড়িয়ে যাবে। এ কারণেই বায়'আত গ্রহণে আমার তাড়াহুড়া নেই, বহু শর্ত-শরায়েতের পর আমি বায়'আত নেই। আমার কোন কোন হিতাকাঙ্ক্ষীর মতে,

এত সব কড়াকড়ি পরিহার করে সাধ্যমত মানুষকে নিজের সান্নিধ্যে জড়াতে দেয়া উচিত। কিন্তু আমার কথা হলো—জড়িয়ে নিয়ে সংশোধন করা যায়—তবে তো কল্যাণ নতুবা তরীকতের সাথে তাদের বন্দী হওয়াই সার হবে, কোন উপকার বয়ে আনবে না। কারণ দ্রুত বায়'আত নেয়া হলে তারা মনে করবে এ তরীকায় সম্ভবত আমলের গুরুত্ব কম। এখন বল, সে তরীকাবন্দী হলো কি-না ? কিন্তু যখন শর্ত দেয়া হবে প্রথম থেকেই তার বদ্ধমূল ধারণা জন্মাবে যে, এখানে আমলের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই সে আমলে তৎপর হবে। এভাবে অব্যাহত তাকীদের ফলে তার চারিত্রিক উন্নতি ঘটবে। আর এ শাসনটুকু সয়ে নিতে সক্ষম হলে আল্লাহ্ চাহেন তো দ্রুত সে পরিমার্জিত হয়ে উঠবে। যদি এ-না হয় তাহলে কেবল লোক ভর্তি করাই সার। মোটকথা, বাতিনী চরিত্র সংশোধন হওয়াই আধ্যাত্মিকতার গোড়ার কথা।

—আল্ জমআইন বাইনান্-নাফ্আইন, পৃষ্ঠা ২৭

৮৬. প্লেগ থেকে পালিয়ে যাওয়া অসঙ্গত আচরণ।

আমি বলি—পালিয়ে যাওয়া মূলত কৌশল নয় বরং অপকৌশল। কারণ মনের দুর্বলতা থেকে যেরূপ পলায়নী মনোভাবের উদ্ভব তদ্রূপ এটা মানসিক দুর্বলতার উৎসও। অর্থাৎ পলায়নকারী এ আচরণ দ্বারা অন্তরে দুর্বলতার প্রাধান্য স্বীকার করে নেয়। চিকিৎসা শাস্ত্রীয় বিধি-মতে এ জাতীয় সংক্রামক ব্যাধি দুর্বল অন্তরে সহজে ও সর্বপ্রথম কবজা জমায়। তাহলে পলায়নকারী পলায়ন মুহূর্তেই যেন নিজেকে প্লেগের কবজায় সোপর্দ করে দিল। মরণ তার এখানে না হোক অন্যত্র হবে। তাহলে বলুন প্লেগ ইত্যাদি সংক্রামক ব্যাধির ভয়ে পালিয়ে যাওয়া সঙ্গত বিবেচনা হলো কি প্রকারে।

দ্বিতীয়ত, আমি বলি—পালিয়ে যাওয়া যদি উপকারী হয়ও এবং পলায়নকারী প্লেগের কবল থেকে ব্যক্তিগতভাবে রক্ষা পেয়েও যায়, তা সত্ত্বেও এহেন ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপকারী কাজ থেকে নিষেধ করা শরীয়তের অধিকার স্বীকৃত। কেননা কোন কোন উপকারী জিনিস থেকে নিষেধ তো আপনারাও দিয়ে থাকেন। যেমন রণক্ষেত্র থেকে পালানো সকল জ্ঞানীজনের মতেই অপরাধ। অথচ পলায়নকারীর আত্মরক্ষামূলক ব্যক্তিগত উপকার এর সাথে জড়িত। কিন্তু আপনাদের নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত একে অপকৌশল আখ্যা দেয়। আমরাও তদ্রূপ প্লেগ থেকে পালানোকে অপকৌশল সাব্যস্ত করি। কারণ শরীয়তের প্রমাণ দৃষ্টে আমাদের মতে প্লেগ থেকে পলায়ন যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালানোর শামিল। প্লেগ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

والفار منه كالفار من الزحف

—"প্লেগ থেকে পলায়নকারী যেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।"

অপর এক হাদীসে প্লেগের স্বরূপ বা প্রকৃতি নির্দেশ করা হয়েছে ঃ وخز اعدائكم الجن। (তোমাদের শত্রু জিনদের আঘাতজনিত ব্যাধি) হিসেবে। এর দ্বারা বোঝা গেল যে, তখন অর্থাৎ প্লেগের প্রাদুর্ভাবকালে জিন ও মানুষের মুকাবিলা হয়। তারা তখন মানুষের দেহাভ্যন্তরে রক্তের মধ্যে যখম করে। ফলে মহামারী আকারে প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। কাজেই মুকাবিলা থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে না। এ কারণেই পলায়ন করা শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ। এ পর্যায়ে প্লেগের প্রকৃতি সম্পর্কে হেকিম ও আধুনিক চিকিৎসকদের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। ডাক্তারগণ রোগজীবাণুকে এর কারণ চিহ্নিত করেন। কিন্তু এটা হাদীসের মর্মবিরোধী নয়। কেননা এর কারণ এটা হোক কিংবা হেকিমদের উল্লিখিত বিষয়, মূল কারণ কিন্তু জিনদের আঘাত আর বাহ্যিক, মানুষের ধারণাকৃত রোগজীবাণু। দ্বিতীয় আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো—এখান থেকে পালিয়ে যারা অন্যত্র গমন করে স্থানীয় লোকদের দৃষ্টিতে তারা হেয়প্রতিপন্ন হয়। বিশেষত প্লেগের স্থান ত্যাগ করে কোন জনপদে বন্ধুর নিকট আশ্রয় নিলে ঘটনাক্রমে তার আগমনের পর বাড়ির কেউ আক্রান্ত হলে বাড়িওয়ালার নযরে সে লাঞ্ছনার পাত্রে পরিণত হয়। আচার-আচরণ ও হাব-ভাবে নিজেই সে অবস্থাটা অনুভব করতে পারে। কারণ বাড়িওয়ালার ধারণায় এ রোগ আগে ছিল না, হতভাগা এখানে আসাতেই এর লক্ষণ দেখা দিয়েছে। আর রোগী যদি ঘটনাক্রমে মারা যায়, তবে বাড়িওয়ালার দৃষ্টিতে তার এ মৃত্যু পলাতকের আমলনামায় লিস্টভুক্ত হয়ে থাকে। কবি বলেছেন ঃ

عزیزے کہ از در گہش سربتافت
بہر در کہ شد ہیچ عزت نیافت

—কোন ব্যক্তি মহান আল্লাহ্র দরবার ত্যাগ করে যে কোন দরবারে আশ্রয় নিক কোন ইজ্জতই তার কপালে জুটবে না।

এ জাতীয় লোক এভাবেই দেশে দেশে প্লেগ জীবাণু ছড়ায়। অবশ্য সংক্রামক ব্যাধি আকারে নয় বরং ভিন্ন জনপদে পালিয়ে গিয়ে জনমনে সন্দেহ সৃষ্টির মাধ্যমে। এমতাবস্থায় পলাতক সম্পর্কে বস্তিবাসীর মন্তব্য হয়—আল্লাহ্ না করুন, আমাদের গ্রামে যেন এ দুষ্ট রোগ দেখা না দেয়। ফলে তাদের অন্তরে তখনি প্লেগ জীবাণু জন্ম নেয়। সুতরাং মহানবী (সা)-এর অসীম দয়া যে, তিনি প্লেগ থেকে পালিয়ে যেতে নিষেধ করেছেন। —আল্-জমআঈন বাইনান্ নাফ্আইন, পৃষ্ঠা ৪৩

৮৭. মুনাফিকের জানাযা নামায সম্পর্কে হযরত উমর (রা)-এর রায় উত্তম হওয়া সংক্রান্ত সন্দেহের জবাব।

এ প্রশ্নের জবাবে বক্তব্য হলো—হযরত উমর (রা)-এর রায়ও মূলত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এরই রায় ছিল, তাঁরই ফয়েয ও বরকত ছিল এটা। কারণ হযরত উমর (রা)-এর মানসিকতায় কাফের-মুনাফেকদের প্রতি ঘৃণা ও রাগ-রোষ নবী-সাহচর্যেরই অবদান। নতুবা ইসলামপূর্ব জীবনে নিজেই তিনি এ প্রেরণাশূন্য ছিলেন, এমনকি রাসূল হত্যার অদম্য আশা নিয়েই তো তাঁর ঘরের বাইরে আসা। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওপর বিশ্বাস স্থাপনের পরই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁর মনে কাফের-মুনাফেকদের সম্পর্কে ঘৃণা ও রোষের সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু হযরত উমর (রা) কেবল উমরই ছিলেন। পক্ষান্তরে মহানবী (সা) একদিকে উমর অপর দিকে রাসূলও ছিলেন। বরং উপরে উঠে বলুন--তিনি ছিলেন--নূহ্, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আ) প্রমুখ রাসূলের সমষ্টি। কবির কণ্ঠে ঃ

حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری

آنچه خوباں همه دارند تو تنها داری

—ইউসুফের রূপ, ঈসার ফুঁক এবং মূসা (আ)-এর শুভ্র হাত তাঁদের সকলের এসব বৈশিষ্ট্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একক চরিত্রে সমাবিষ্ট।

বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্রে কাফেরদের প্রতি রাগ-রোষ যেমন তদ্রূপ তাদের প্রতি দয়ামায়াও ছিল মহান আকারে। কিন্তু তাঁর চরিত্রে দয়ারই ছিল প্রাধান্য। কাজেই রহমতের কোন সূত্র ও উসীলা পাওয়া মাত্র একে সদ্ব্যবহারে তিনি সচেষ্ট হয়ে উঠতেন। কিন্তু এ জাতীয় কোন উপলক্ষ না থাকা অবস্থায় তিনি ক্রোধ প্রকাশে বাধ্য হয়ে যেতেন। সুতরাং আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিক হওয়া সত্ত্বেও প্রকাশ্য কাফের ছিল না। আর মুনাফিকদের বিধান ও বিঘোষিত কাফেরদের হুকুমের মধ্যে স্পষ্ট ব্যবধান ছিল। পার্থিব বিষয়ে তাদের এবং মুসলমানদের আচরণবিধি ছিল অভিন্ন প্রকারের আর পরকালীন বিধান তখনো অবতীর্ণ হয়নি। কাজেই দয়ার প্রাবল্যের দরুন পার্থিব বিধানের সাথে তুলনা করে তার সাথে তিনি মুসলমান মৃতদের ন্যায় আচরণ করছেন। কিন্তু হযরত উমর (রা) ক্রোধ ও কঠোরতার আধিক্যবশে পার্থিব বিধানকে সাময়িক এবং প্রয়োজনের ওপর ভিত্তিশীল ধারণা করে মুনাফিক তথা কপট মুসলমানের মৃত্যুর হুকুম বিঘোষিত কাফেরের সাথে তুলনা করেছেন। মূলত এটা হুযূর (সা)-এর ফয়েয ছিল যা তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। মহানবী (সা) দয়ার আধিক্য

হেতু প্রথমোক্ত তুলনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অবকাশ থাকা পর্যন্ত দয়া-রহমতের দিকটাই তিনি গ্রহণ করতেন। বস্তুত মহানবী (সা)-এর এহেন আচরণ মুসলমানদের প্রশান্তির কারণ। কারণ তাঁর চরিত্র ছিল ঃ

دوستاں را کجا کنی محروم

تو که بادشمنان نظر داری

"আপনার দয়ার দৃষ্টি শত্রু পর্যন্ত প্রসারিত, সে ক্ষেত্রে প্রিয়জনের বঞ্চিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না।" অপর মনীষীর ভাষায় ঃ

چه غم دیوار امت را که باشد چوں تو پشتیبان

چه باك از موج بحر ان را که دارد نوح کشتی بان

—হে রাসূল (সা)! আপনার ন্যায় পৃষ্ঠপোষকের বর্তমানে উম্মতের কি ভয়, সাগর তরঙ্গে সে জনের ভয় কি যার নৌকার হাল নূহ নবীর হাতে।

এ প্রসঙ্গে যাহেরী আলিমদের নিকট আমার প্রশ্ন—কুরআনের আয়াত ঃ استغفر لهم او لا تستغفر لهم (তুমি তাদের পক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর) দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের প্রতি ক্ষমা প্রার্থনার অধিকার প্রদত্ত হওয়ার অর্থ কিরূপে গ্রহণ করলেন। অথচ আয়াতের মর্মানুযায়ী তাদের জন্য দোআ ও ইস্তিগফার করা আর না করা উভয় সমান, তাদের কোন উপকারে আসবে না। আরবীভাষীদের নিকটও বিষয়টা অজ্ঞাত নয়। অনুরূপ ঃ ان تستغفر لهم سبعين مرة (এদের জন্য তুমি সত্তরবার ইস্তিগফার করলেও) আয়াতাংশে সংখ্যার উল্লেখ সীমিতকরণ অর্থে বলা হয়েছে যে, সত্তরবার ক্ষমা চাইলেও মাফ নেই। ক্ষমা পেতে হলে সত্তরের অধিক বার মাফ চাওয়া লাগবে! এখানে সংখ্যার উল্লেখ মূলত এরূপ, আমাদের চলতি কথায় যেমন বলা হয়—একশবার বললেও মানব না, হাজারবার অনুরোধ করলেও কিছু হবে না। এ কথার অর্থ এই নয় যে, হাজারের অধিক বলাতে মাফ হবে। বরং উদ্দেশ্য এই যে, এ কথা কোন অবস্থাতেই মানা হবে না। সংখ্যার উল্লেখ কেবল আধিক্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে বক্তব্যে জোর দেয়ার জন্য, সংখ্যা নির্ণয়ের লক্ষ্যে নয়। অতঃপর মহানবী (সা) خيرت فاخترت وسازيد على السبعين (অর্থাৎ আমাকে অধিকার দেয়া হয়েছে তাই আমি ইখতিয়ার করেছি এবং আমার চাওয়া সত্তরের মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে।) উক্তি কিরূপে করলেন? যাহেরপন্থী আলিমগণের পক্ষে এর সন্তোষজনক জবাব দেয়া সম্ভব নয়। আর যারা কেবল কুরআন শরীফের অনুবাদ পড়ে ইজতিহাদের দাবিদার—জবাব

তারা দিবেই বা কি ? শুনুন রূহানী আলিমগণের পক্ষ থেকে জবাব আমি পেশ করছি। মাওলানা মুহম্মদ ইয়াকুব (র) এ প্রশ্নের জবাবে বলেছেন ঃ তখন অনুগ্রহশীলতার আধিক্যের দরুন মহানবী (সা)-এর লক্ষ্য আয়াতের ভাবার্থের প্রতি নয় বরং ছিল কেবল শব্দের কাঠামোগত আকৃতির প্রতি। অবশ্য পরিভাষায় এ জাতীয় অর্থ গ্রহণের অবকাশ না থাকলেও আলোচ্য আয়াতের শব্দ কাঠামোতে ইখতিয়ার ও সীমাবদ্ধতা উভয় অর্থের সুযোগ রয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, ওলিয়ে কামিলগণের মনোজগতে কোন কোন সময় অবস্থার প্রাধান্য (غلبه حال) সৃষ্টি হয়ে থাকে। —আল-মুরাবিত, পৃষ্ঠা ৩৯

৮৮. নামাযে পূর্ণতা অর্জনের বাঞ্ছিত উপায়।

নামাযে পূর্ণতা লাভের উদ্দেশ্যে মৃত্যু এবং আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিতির কল্পনা ও ধ্যানে (مراقبه) অভ্যস্ত হওয়া উচিত। আমার মতে আয়াতের অর্থ হলো—নামায পড়া অবস্থায়ও উক্ত মুরাকাবায় (আল্লাহ্‌র ধ্যানে) অন্তর লিপ্ত ও ধ্যানমগ্ন রাখা বাঞ্ছনীয়। এর উপায় এই যে, নামায পড়া অবস্থায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ গভীরভাবে চিন্তা করবে ঃ সমগ্র দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে হাত বেঁধে আমি এমনভাবে দাঁড়িয়েছি যে, কারো সাথে কথা বলা, কারো প্রতি দৃষ্টি দেয়া এবং পানাহার করা এখন আমার জন্য নিষিদ্ধ। এর কারণ—আমি আল্লাহ্‌র দরবারে দণ্ডায়মান, তাঁরই সামনে অনুনয়-বিনয়াবনত। দাঁড়ানো অবস্থায় চিন্তা করবে—মহান আল্লাহ্‌র অফুরন্ত অনুগ্রহ আমার ওপর, যে সবের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমার জন্য ওয়াজিব। অতঃপর সূরা ফাতিহা পাঠকালে চিন্তা করবে—আমি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজির শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) আদায় করছি, তিনি পালনকর্তা—'রব', আমি নিজে তাঁর সৃষ্ট বান্দা হওয়ার স্বীকৃতি জ্ঞাপন করছি। আমি আল্লাহ্‌র দাসত্বে অটল থাকা এবং গোলামির নিয়মানুযায়ী চলার আবেদন জানাই। দাসত্বের পথ পরিহারজনিত কারণে অভিশপ্ত-পথভ্রষ্টদের ওপর থেকে আমি অসন্তুষ্টির ঘোষণা দিচ্ছি। সর্বোপরি আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত দাসত্ব বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার নিষ্ঠাপূর্ণ অঙ্গীকার করছি। ফাতিহার পর সূরা পাঠেরও একই অর্থ। এরপর রুকূতে যাওয়ার কালে চিন্তা করবে—পদতলের এ মাটি থেকেই আমার সৃষ্টি, এর উপাদান থেকেই চোখ-কানবিশিষ্ট জীবন্ত মানবের সৃষ্টিকৌশল একমাত্র আল্লাহ্‌র ক্ষমতাধীন বিষয়। এ থেকে উৎপন্ন দ্রব্যের সংমিশ্রণে যার জন্ম এহেন সৃষ্টের পক্ষে বন্দেগী বা দাসত্ব ছাড়া দ্বিতীয় কিছু মানায় না। শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব কেবল পবিত্র আল্লাহ্‌র পক্ষেই শোভনীয়। নামাযে বারংবার আল্লাহু আকবার (আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ) উচ্চারণের তত্ত্বগত রহস্য এখানেই—হে খোদা! তোমার মহত্ত্বের সামনে নিজের কাল্পনিক মান-মর্যাদা কুরবান করে দিলাম। সিজদায় লুটিয়ে পড়ার মুহূর্তে চিন্তা করবে—একদিন আমাকে এই মাটির বুকে আশ্রয় নিতে হবে, তখন আল্লাহ্ ছাড়া কোন সাহায্যকারী থাকবে না। দুনিয়া থেকে আমার নাম-নিশানা, অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলীন হয়ে যাবে। দ্বিতীয় সিজদায় কল্পনা করবে—আমার যেন মৃত্যু ঘটেছে, এখন আমি আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে, তিনি ব্যতীত আমার কেউ নেই। তাশাহুদের বৈঠকে চিন্তা করবে—মরণের পর আরো একটি জীবন রয়েছে, সেখানে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে আন্তরিকতার সাথে কৃত নেক আমলই উপকারে আসবে। সেদিন মহানবী (সা)-সহ সমস্ত আম্বিয়া, ফেরেশতা ও পুণ্যাত্মাগণের সম্মান প্রকাশ পাবে। তাঁরা পাপী-তাপী বান্দার পক্ষে সুপারিশ করবেন। তাই তাঁদের প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠিয়ে সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। এ পর্যায়ে মহানবী (সা)-এর সাথে উম্মতে মুহাম্মদীর সর্বাধিক ঘনিষ্ঠতার দরুন শেষ রাকাতে তাঁর প্রতি বিশেষ দরূদ পাঠ করা বাঞ্ছনীয়। অন্তরে এ কল্পনা বদ্ধমূল হওয়ার পর শেষ বৈঠকে কল্পনা করবে—মরণের পর আমি এখন কিয়ামতের ময়দানে দণ্ডায়মান। ভাল-মন্দ, নেক-বদ দুনিয়ার যাবতীয় আমল আমার সামনে উপস্থিত, এর মধ্য হতে ইখ্‌লাসের সাথে আল্লাহ্‌র নামে কৃত কর্মই একমাত্র কাজের, বাকি সব অকাজের। রাসূলুল্লাহ্ (সা), সমস্ত আম্বিয়া, পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গ, ফেরেশতাকুল মহান আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত। তাঁদের প্রতি আমার দরূদ ও সালাম। পরিশেষে নিজের জন্য আমি মুক্তি ও সাফল্য কামনা করছি। এ কারণেই আয়াতে يظنون (তারা ধারণা করে) শব্দের অবতারণা করা হয়েছে। অথচ আল্লাহ্‌র সাক্ষাতের বিশ্বাস পোষণ করা ফরয, শুধু ظن তথা ধারণা যথেষ্ট নয়। কিন্তু নামাযের মধ্যে আল্লাহ্‌র সাক্ষাত, তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তনের মানসিক ও কল্পনাগত উপস্থিতি যেহেতু উদ্দেশ্য কিন্তু বাস্তবতুল্য দৃঢ় ই'তিকাদ অনিবার্য নয় বরং নামাযে এর কল্পনাই যথেষ্ট। যেমন—মরণের পর এখন আমি আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত কিংবা মৃত্যুপথযাত্রী অথবা এখন আমি পরজগতের বাসিন্দা ইত্যাদি। এ কারণে এ ক্ষেত্রে ظن শব্দটি প্রযোজ্য হয়েছে। এভাবে নামায আদায় করা হলে তাতে ভীতি ও আশাব্যঞ্জক একাগ্রতা সৃষ্টি হবে এবং অন্তর থেকে যাবতীয় কু-চিন্তা দূরীভূত হয়ে যাবে। —আল-হজ্জ, পৃষ্ঠা ১৮

৮৯. বর্তমানে যেভাবে চাঁদা আদায় করা হয়—তার অশুভ পরিণাম।

আজকাল ব্যক্তিবিশেষকে সেক্রেটারী কিংবা সদস্যপদ এ জন্য দেয়া হয় যে, ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে তিনি গরীবদের ওপর ট্যাক্সের ন্যায় চাঁদা বসিয়ে

আয়-আমদানি বাড়াতে পারেন। এ কাজে তার প্রশংসাও করা হয়—বাহ্, অমুক সাহেব দীনের কাজে একেবারে নিবেদিতপ্রাণ। সুবহানাল্লাহ্! গরীবের গলায় ছুরি দিয়ে চাঁদা আদায় করা যদি দীন ইসলামের বিরাট কাজ হয়, তাহলে দিন-দুপুরে ডাকাতি করা তো তার চাইতেও উত্তম। যেহেতু পরের অর্থ লুট করে সে পরিবারের আহার যুগিয়েছে যা তার ওপর ওয়াজিব ছিল। অবশ্য তার উপার্জন হারাম পথে কিন্তু খরচের স্থানটা এমন—যে খাতে ব্যয় করা তার ওপর ওয়াজিব ছিল। সুতরাং সে হারামের আশ্রয়ে ওয়াজিব থেকে তো অব্যাহতি পেল। আর সেক্রেটারী সাহেব হারাম পথে চাঁদা তুলে ব্যয় করেন এমন খাতে যার খিদমত তার ওপর ওয়াজিব ছিল না। কেননা আঞ্জুমান বা সমিতির খিদমত তার ওপর ওয়াজিব নয়। ডাকাতের সাজা কারো অজানা নয়। তাই তারাও এ জন্য প্রস্তুত থাকুন। দুঃখের বিষয় চাঁদা আদায়ের বেলায় আজকাল এদিকটা আদৌ লক্ষ করা হয় না যে, টাকা কি স্বেচ্ছায় দেয়া হলো না বলপূর্বক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—স্ত্রীর মাল সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْئٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْاً مَّرِيْئًا

—"সন্তুষ্টচিত্তে তারা মোহরের কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করবে।" এখানে 'সন্তুষ্ট' শব্দ দ্বারা স্ত্রীর দানকে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। অথচ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরস্পর প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ক, যাতে অসন্তুষ্টির ঘটনা অতি বিরল। এমতাবস্থায় সন্তুষ্টি ব্যতীত গরীবদের মাল গ্রহণ করা কিরূপে জায়েয ? কুরআনের অন্যত্র স্ত্রীর ব্যাপারে আরো কড়া সুরে বলা হয়েছে ঃ

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلاَّ
اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَاَنْ تَعْفُوْا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى –

—"তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ (মিলন) করার আগেই তালাক দিয়ে দাও আর মোহর ধার্য করা থাকে, তবে স্ত্রী অর্ধেক মোহর পাবে যদি না স্ত্রী অথবা যার হাতে বিবাহ-বন্ধন রয়েছে সে (অর্থাৎ স্বামী) মাফ করে দেয়, (তাহলে স্ত্রী পূর্ণ মোহর পাবে) আর (হে পুরুষগণ) তোমরা মাফ করে দাও। এটা তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।" অর্থাৎ স্ত্রীর ক্ষমার অপেক্ষা না করে স্বামী নিজের হক মাফ করে দেয়াই অধিক উত্তম।

অতএব প্রণিধানযোগ্য যে, স্ত্রী নিজের হক বা মোহর স্বেচ্ছায় মাফ করে দেয়া অবস্থায় স্বামীর পক্ষে তা গ্রহণ করা জায়েয এবং শরীয়ত সমর্থিত। কিন্তু এক্ষেত্রে

শিষ্টাচারের অপর একটি দিকের প্রতিও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, আত্মমর্যাদার দাবি হলো—স্ত্রীর ক্ষমা তুমি কবূল করবে না বরং তোমার নিজের পাওনা স্ত্রীকে দান করে তুমি তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর। অতএব স্ত্রীর সাথে লেনদেন এবং তার দান গ্রহণের বেলায় শিষ্টাচার ও আত্মমর্যাদা রক্ষার যে শিক্ষা তা এরূপ হলে চাঁদা উসুলের ক্ষেত্রে কি কোন আদব ও শিষ্টাচারের আবেদন বাঞ্ছনীয় নয় ? অবশ্যই আছে এবং তা রক্ষা করাও ওয়াজিব। আমাদের পবিত্র শরীয়ত 'হাদিয়া' (উপঢৌকন) গ্রহণের ক্ষেত্রে পর্যন্ত আদব ও নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে একটি আদব হলো ঃ

مَا اتاك من غير اشراف نفس فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك –

—তোমার মনের কামনা ও অপেক্ষা ছাড়া আগত হাদিয়া গ্রহণ কর কিন্তু যা অপেক্ষার পর আসে তার প্রতি মন দিও না। —আস্‌লুল ইবাদাহ, পৃষ্ঠা ৬

কিন্তু চাঁদার বেলায় এমন সব কৌশল অবলম্বন করা হয় যাতে সভাস্থ লোকেরা লজ্জার খাতিরে হলেও এক টাকার স্থলে পাঁচ টাকা দান করে। মনে রাখা দরকার এটা একটা না-জায়েয পন্থা। অথচ মানুষের ধারণা—এ ব্যবস্থা ছাড়া কাজ অচল হয়ে পড়বে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো—আসল উদ্দেশ্য তাহলে কি, কাজ না দীন ? কাজটাই যদি আসল উদ্দেশ্য হয়, তাহলে মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্ন স্তরে থাকার কি কারণ ? কেননা তারাও তো জিহাদ-সদকা ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করত। তাই বোঝা গেল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিহীন কাজ কোন কাজই নয়। মুসলমানের আসল উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা, কাজ কম হোক কিন্তু হতে হবে আল্লাহ্‌র পসন্দমত। যেমন—ইয়াতীমখানা বিরাট কিন্তু এতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অবর্তমান, এমতাবস্থায় এর দ্বারা লাভ কি ?

এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত এক সংস্থার (আমি নাম বলব না) ঘটনা উল্লেখযোগ্য। শুনে আমি অবাক হয়েছি যে, লক্ষ্ণৌর জনৈক বিত্তশালী ব্যক্তি বহু টাকা মূল্যের বিরাট সম্পত্তি একজন অভাবী পরহেজগার আলিমের খেদমতে পেশ করে বলল—এটা গ্রহণ করে আপনার পসন্দমত খরচ করুন। তিনি অস্বীকার করলেন। অতপর সংস্থার কর্মকর্তাদের সামনে পেশ করে বলল ঃ আমার পক্ষ থেকে এ সম্পত্তি সংস্থার নামে ওয়াকফ করে নিন। তারা সানন্দে কবূল করে নিল। এ নিয়ে স্থানীয় লোকজন মজার কাহিনী রটাল ঃ "মিয়া, উক্ত বুযুর্গ একা কিনা, তাই পাপের বোঝা বহনে অক্ষম কিন্তু সংস্থাওয়ালারা যেহেতু মোটাসোঁটা, তদুপরি সংখ্যায় অনেক তাই ভাগ-বাটোয়ারা করে সবাই মিলে অল্প অল্প বহন করতে অসুবিধা হবে না।" এ ঘটনা দ্বারা বোঝা যায়

তাদের উদ্দেশ্য সংস্থা চালানো, "রেযায়ে হক" বা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি তাদের উদ্দেশ্য নয়, নতুবা হালাল-হারামের কিছুটা পরোয়া থাকা উচিত ছিল। সামাজিক মর্যাদা লাভের উদগ্র বাসনাই এ-সব নষ্টের গোড়া। যেহেতু কাজ দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য নাম ও খ্যাতি অর্জন করা। আমার 'ডীগ' অবস্থানকালে কোনও এক সংস্থার সেক্রেটারী এক সাক্ষাতকারে আমার নিকট সংস্থার প্রতি লোকদের অনীহা ও অনাগ্রহের প্রশ্ন তুলল। আমি বললাম—লোকদের অভিযোগ এবং তাদেরকে কাজে লাগানো আপনার কি প্রয়োজন। প্রথমে সাধ্যমত আপনি নিজেই কাজ শুরু করুন, অপরকে বিরক্ত করার প্রয়োজন কি ? দেখবেন মানুষের মধ্যে আপনা হতেই উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে। সে লোক চলে যাওয়ার পর লোকেরা মন্তব্য করল—লোকটার রোগ আপনি ঠিকই ধরেছেন। ঘটনা তা-ই—নিজের গা বাঁচিয়ে অন্যদের থেকে চাঁদা আর কাজ আদায়ে তার বড় শখ। নিজে কাজের ঘরে শূন্য থাকলেও পদটা চাই তার সেক্রেটারীর। মোটকথা, আজকালের বাস্তবের সাক্ষী হলো—মানুষ দীনের খিদমত করে সুনামের আশায়, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনায় নয় —ঐ, পৃষ্ঠা ৯।

৯০. পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া আল্লাহ্ কর্তৃক জান্নাত না দেয়ার কারণ।

এ প্রশ্নের জবাব হলো—বিনা পরীক্ষায় সবকিছু দান করা অবশ্যই আল্লাহ্‌র ক্ষমতাধীন কিন্তু এটা তাঁর চিরন্তন নীতির পরিপন্থী। বস্তুত বাস্তব পরীক্ষার মাধ্যমেই আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে নৈকট্য দান করেন। এ নৈকট্য মূলত মুক্তি। আর বিচ্ছিন্ন ও দূরত্বের অর্থ ধ্বংস। এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন ঃ

شنیده ام که سخن خوش که پیر کنعان گفت
فراق یار نه آں میکند که بتواں گفت
حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر
کنائتست که از روز گار هجراں گفت

—কেনানের মহামানব তথা হযরত ইয়াকুব (আ)-এর ভাষায় মূল্যবান সুর ধ্বনিত হতে শুনেছি যে, বন্ধুর বিরহ জ্বালা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। জনৈক উপদেশদাতা বলেছেন ঃ বিচ্ছেদ যাতনা এতই বেদনা-বিধুর যা একমাত্র কিয়ামতের ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সাথেই তুলনা করা যেতে পারে।

এ পর্যায়ে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ – (মানুষ কি মনে করে যে. "আমরা ঈমান গ্রহণ করেছি" একথা বললেই পরীক্ষা ছাড়াই তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া হবে ?) "এ পরীক্ষার কি কারণ ?" এ প্রশ্নের সমাধানে তত্ত্বগত বিস্তারিত আলোচনা থেকে বিরত থাকাই আমাদের বুযুর্গানের নীতি (مسلك)। এ পর্যায়ে তাঁদের পন্থা হলো— ابهموا ما ابهمه الله যে, আল্লাহ্ যে বিষয়টি অস্পষ্ট রেখেছেন তোমরাও তা গোপন রাখ। সুতরাং আমাদের মোটামুটি আকীদা এই যে, বিষয়টা যদিও আমাদের অজ্ঞাত কিন্তু পরীক্ষার ভিতর কল্যাণকর বিষয় অবশ্যই নিহিত রয়েছে। এ সম্পর্কে আমার ধারণা পরীক্ষাবিহীন আনুগত্য কাম্য হলে মানুষ সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল না, পূর্ব থেকেই অনুগত ফেরেশতাকুল এ কাজের যোগ্যতম প্রতিনিধি হিসেবে বিদ্যমান ছিল। কারণ পরীক্ষা ব্যতীত তাদের আনুগত্য চলে আসছে চিরন্তন রীতিতে আর বিরোধিতার উপাদান তাদের সত্তায় অনুপস্থিত। কিন্তু প্রতিদানের পরিপূর্ণতার লক্ষ্যে এবং সীমিত পরিমণ্ডলে মানবসত্তা বিরোধমুখী উপাদান মিশ্রণে গঠিত। কারণ বিরোধিতাবিহীন আনুগত্যের তুলনায় বিরোধপূর্ণ ইবাদত-আনুগত্য উত্তম পর্যায়ের, যেহেতু এর পিছনে মানুষের চেষ্টা সাধনার বাস্তব ভূমিকা কার্যকর। "সীমিত পরিমণ্ডলের" বিশেষণ এজন্য যুক্ত করা হয়েছে যে, বিরোধিতা একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে যদি সীমাবদ্ধ রাখা না হয়, তবে তো الدين يسر (দীন সহজ-সরল জিনিস) হাদীস এ-উক্তির পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই এ বিশেষণ যুক্ত করা আমি প্রয়োজন মনে করি। অবশ্য এ বিরোধিতা সংঘটিত হয়ে থাকে কেবল প্রাথমিক পর্যায়ে, আমল-ইবাদতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর এ-ও বাকি থাকে না। আল্লাহ্‌র হুকুম পালন তখন মজ্জাগত হয়ে দাঁড়ায়। তাই বাহ্যিক ও অনুভূতিশীল ক্রিয়াকর্মেও এ একই নীতি কার্যকর লক্ষ করা যায়। যথা—চলার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপেই কেবল ইচ্ছার প্রয়োজন। হাঁটা-চলা একবার শুরু হয়ে গেলে প্রতি পদে, যে কোন পদক্ষেপে নিয়তের দরকার পড়ে না সূচনাকালীন নিয়তকেই পদে পদে কার্যকর ধরা হয়। যার ফলে একে ইচ্ছাধীন কর্ম (فعل اختیاری) বলা হয়। এখন প্রশ্ন ওঠতে পারে যে, দ্বন্দ্ববিহীন ইবাদত অপেক্ষা বিরোধপূর্ণ ইবাদতের সওয়াব যেহেতু অধিক কাজেই সূচনা উত্তর কাজের সওয়াব কম হওয়া স্বাভাবিক। এ প্রশ্নের জবাব এই যে, এক্ষেত্রে পরবর্তী আমলসমূহের সওয়াবও বিরোধপূর্ণ প্রাথমিক আমলের সমপরিমাণ দান করাই আল্লাহ্‌র বিধান। এটা তাঁর অপার অনুগ্রহ। কেননা বিরোধমুখর প্রতিকূল পরিবেশে আমলের স্থায়ী মনোভাব নিয়েই সে কাজ আরম্ভ করেছিল। তাই দেখা যায় নামায-রোযা ইত্যাদি প্রতিটি হুকুম

আদায়কারী প্রত্যেক মুসলমানের নিয়ত এই থাকে, যতই কষ্টকর হোক জীবনভর আমি নামায-রোযা আদায় করে যাব।

অতপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে পরবর্তী সময়ে মনের সে বিরোধী ভাবের বিলুপ্তি ঘটে। কিন্তু যেহেতু এর মুকাবিলার দৃঢ় মনোভাব নিয়েই বান্দা আমল শুরু করেছিল, তাই সে ভাব কেটে যাওয়ার পরও তার নিয়তের প্রেক্ষিতে পূর্বের ন্যায় সে একই পরিমাণ সওয়াবের অধিকারী হবে। যেমন 'চলা' শব্দটিকে ইচ্ছাধীন 'ক্রিয়া' আখ্যা- দানের কারণ এই যে, সূচনাকালে বান্দার ইচ্ছা এখানে অপরিহার্য, পরে যদিও সে প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে না। এখানেও তদ্রূপ, পরে যদিও বিরোধিতার প্রয়োজন থাকে না কিন্তু প্রথমে থাকে। এ কারণে এটাকেই বিরোধিতার চূড়ান্ত পর্যায়রূপে মেনে নেয়া হয়। এর দ্বারা মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের পরিচয় লাভ করা যায়। নতুবা বিবেকের দাবির প্রেক্ষিতে মনের বিরোধীভাব বিলুপ্ত হয়ে ইবাদতে স্বাদ আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়ার পর সে ব্যক্তি সওয়াবের অধিকারী না হওয়াই সঙ্গত ছিল। কারণ তার এ মুহূর্তের ইবাদতে পরীক্ষার কোন নিদর্শন নেই। তাই বিবেকের দাবি হলো—সে ব্যক্তি প্রতিফলের অধিকারী না হওয়া। কিন্তু আল্লাহ্‌র ঘোষণা হলো—হে মানুষের বিবেক! আমার বান্দার প্রতি ভালবাসার অভাব হেতু তোর এ যুক্তি কিন্তু এখন তার কষ্টকর সাধনার অবসান সত্ত্বেও তাকে আমি মনের সাথে মুকাবিলার সওয়াব দ্বারা অবসরকালীন পেনশন জারি করব। অথচ বিবেক এ পেনশনের বৈধতা স্বীকার করে না। যেরূপ 'মুতাযিলা' সম্প্রদায়ের আকীদা হলো—গুনার শাস্তি দেয়া আল্লাহ্‌র জন্য জরুরী, ক্ষমা করা যুক্তিবিরোধী চিন্তা। সার কথা—আমলে মজবুতী ও দৃঢ়তা সৃষ্টি হওয়ার পর বান্দার অবস্থা কোন কোন পীরের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল বলে প্রতীয়মান হয়। জনশ্রুতি রয়েছে—উক্ত পীর সাহেব মুরীদের বাড়ি দাওয়াত খাওয়ার পর নযরানাও গ্রহণ করতেন, যাকে "দাঁত ঘষাই" নামে আখ্যায়িত করা উচিত। অতএব এ ব্যবস্থা গ্রহণ দ্বারা আল্লাহ্ জানিয়ে দিলেন যে, তিনি বান্দার "দাঁত ঘষাই" দিয়ে থাকেন। কেননা শেষের দিকের ইবাদতে আয়াসসাধ্য কোন কৃতিত্ব থাকে না, বর্জন করাই বরং কষ্টকর হয়। যেরূপ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—كان خلقه القران অর্থাৎ মহানবী (সা)-এর চরিত্র কুরআনের রংয়ে রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর চরিত্রই যেন জীবন্ত কুরআনরূপে বিচরণ করত। অবশ্য এ স্বভাব ছিল তাঁর জন্মগত ও সহজাত। কিন্তু শেষের দিকে কামিল মনীষীবৃন্দের ইবাদতের অবস্থাও প্রায় অনুরূপ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তাঁদের অবস্থা তখন—"মায়ের স্তন ছেড়ে সন্তানের খেলার পানে ছুটে যাওয়া আর থাপ্পড় মেরে মা তাকে নিবৃত করার" ন্যায়। তাই তাঁদের প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ

থেকে শাসন-সতর্কবাণী মূলত তাঁর দয়া-অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু আমি বলব—মুবতাদীর (প্রাথমিক পর্যায়ের আমলকারীর) ক্ষেত্রেও তা রহমত ও দয়াস্বরূপ। স্বভাবগতভাবেই মানুষের অন্তর আল্লাহ্‌র ভালবাসায় আপ্লুত। আর নির্দেশ পালনে মুবতাদীর মানসিক বিরোধিতা ভালবাসার পরিপন্থী নয়। কিংবা তার এ অবস্থা অবাধ্যতার ইঙ্গিতবাহীও নয় বরং এ হলো—ভালবাসার আকর্ষণজড়িত অভিনয়ের সুরে প্রেমাস্পদ আল্লাহ্‌র দরবারে তার প্রেমিকসুলভ ও মিনতিপূর্ণ আবদার যে, তোমার প্রতি আমার এত ভালবাসা এত আসক্তি, তা সত্ত্বেও এত সব বিধিবিধান, এহেন আদেশ-নিষেধে আমাকে জড়ানোর কি অর্থ ? আমাকে তো আমোদ-আহলাদ, আনন্দ-উল্লাসে রাখা উচিত ছিল। অতঃপর তার ভাবালুতাপূর্ণ কণ্ঠে উচ্চারিত হয় ঃ

هم نے الفت کی نگا ہیں دیکھیں

جانیں کیا چشم غضناك كو هم

—এতদিন যাবত আমার প্রতি তার প্রেমের দৃষ্টি লক্ষ করে আসছি, সে আমার দিকে ভালবাসার নযরে তাকাত। কিন্তু তার রোষায়িত লাল চোখের কথা আমার জানা নেই। —সোবীলুস-সাঈদ, পৃষ্ঠা ৪

৯১. চাঁদ দেখায় মতপার্থক্যের দরুন একাধিক শবে কদর সন্দেহের সমাধান।

এটা সবার জানা কথা, এমনকি বিজ্ঞানী মহলেও স্বীকৃত যে, বায়ুমণ্ডলের উপর স্তরে দিবা-রাত্রির কোন অস্তিত্ব নেই, সবই সমান। দিন-রাতের ঘূর্ণনজনিত ব্যবধান কেবল বায়ুমণ্ডলের নিম্ন স্তরের ব্যাপার। আমার চিন্তায় এ সমাধান জড়ো হওয়ার পর মনে বড় আনন্দ অনুভব করি। এর দ্বারা আরো একটা বিষয় পরিষ্কার হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মি'রাজের ঘটনায় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কেবল মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণের উল্লেখ করা হয়েছে, ঊর্ধ্বাকাশ ভ্রমণের কোন উল্লেখ তাতে পরিলক্ষিত হয় না। কোন কোন সূফী আলোচ্য আয়াতের ভিত্তিতে মহানবী (সা)-এর ঊর্ধ্বাকাশ ভ্রমণ অস্বীকার করেন। কিন্তু তারা লক্ষ্য করেননি যে, মি'রাজের উক্ত আয়াত (রাত) শব্দ সম্বলিত। তাই তাতে ভ্রমণের পরিধি ততটুকুই বিস্তৃত করা সঙ্গত, যা রাতের সীমিত পরিমণ্ডলে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বলা বাহুল্য, ঊর্ধ্বাকাশের ভ্রমণ দিন-রাতের আওতার বাহির জগতে অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে দিন-রাতের ব্যবধান অনুপস্থিত। তাই উক্ত আয়াতকে আকাশ ভ্রমণের বিপক্ষ দলীলরূপে উপস্থিত করা অবান্তর কথা। তবে তারা এ কথা বলতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আকাশমণ্ডল ভ্রমণ কাজ রাতে অনুষ্ঠিত হয়নি।

আমরাও একথা সমর্থন করি এবং আরো এক ধাপ উপরে উঠে বলি—আকাশ ভ্রমণ রাতে হয়নি, দিনেও হয়নি বরং তা হয়েছে এমন এক মহাজাগতিক পরিমণ্ডলে যেখানে দিন-রাতের কোন অস্তিত্বই নেই।

মোটকথা, শবেকদর সম্পর্কে বর্ণিত ফযীলত ও মর্তবা দিন-রাতের সাথে শর্তযুক্ত নয়। বরং আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অধীন, সময়ের যেকোন একটা অংশে হলেই হলো। বৃষ্টির উপমার সাথে মিলিয়ে বিষয়টা আরো পরিষ্কার করা যেতে পারে। মনে করুন—বায়ুমণ্ডলের বরাবর নিচে ভূ-পৃষ্ঠের আমাদের অত্র এলাকায় আজকে বৃষ্টিপাত হলো কিন্তু একই বায়ুমণ্ডলীয় জগতের নিম্নস্থ কলকাতা অঞ্চলে হলো পরের দিন। এখন শবে কদরের অবস্থাও যদি তাই হয় যে, আজ এখানে কাল কলকাতায় তাহলে আপত্তির কি আছে? বারিপাতে এ জাতীয় ব্যবধান কি হয় না? তাহলে আধ্যাত্মিক ও রূহানী বরকতময় বৃষ্টির বর্ষণজনিত এ জাতীয় ব্যবধানে বিস্ময়ের কি আছে। কাজেই নিজেদের নির্ধারিত তারিখে আপনারা নিশ্চিন্তে কাজ করুন। প্রত্যেকের নিয়ত ও আমল মহান আল্লাহ্‌র দৃষ্টিসীমায়। যার যার হিসেব অনুযায়ী প্রত্যেককেই তিনি শবে কদরের বরকত ও ফযীলত দান করবেন। —ইকমালুল ইদাহ্, পৃষ্ঠা ২৮

৯২. শুধু কিতাব পাঠে নিজের সংশোধন সম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গে কিতাব পাঠ করা আমি বেকার বলি না, উপকারী অবশ্যই কিন্তু তা কেবল চিকিৎসকের জন্য, রোগীর জন্য নয়। কিতাব পত্রে সবকিছু বর্ণিত থাকা সত্ত্বেও কোন রোগী চিকিৎসা গ্রন্থ দ্বারা আপন চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে না। অথচ একই গ্রন্থের সহায়তায় চিকিৎসক তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ছিটেফোঁটা দু-এক রোগের ব্যবস্থা কেউ যদি করেও নেয় কিন্তু কঠিন রোগের চিকিৎসা তার দ্বারা সম্ভবই নয়। সুতরাং বুহ্‌রানের (জ্বরবিকার) বিস্তারিত বিবরণ কিতাবে বর্ণিত রয়েছে কিন্তু সবাই তা অনুধাবনে সক্ষম নয়। সেখানে বর্ণনা এত সূক্ষ্ম যে, আধুনিক ডাক্তাররা এর তত্ত্বগত বিশ্লেষণে অপারগ হয়ে অবশেষে অস্বীকৃতির ঘোষণাই দিয়ে বসেছে যে, 'বুহ্‌রান' বলতে রোগ প্রকৃতির অস্তিত্বই নেই। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক চিকিৎসাবিদগণ এর সূক্ষ্ম পর্যালোচনার পর এত তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্লেষণ দিয়েছেন যে, শুনলে মনে হয় যেন তাদের নিকট এ বিষয়ের 'ইলহামী' তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। সুতরাং তারা জ্বরাক্রমণের দিনগুলিকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, কোন কোন দিন রোগ আর মানব দেহের মধ্যে পারস্পরিক মুকাবিলা চলে, একে অপরকে দাবানোর জোর চেষ্টা চালায়। এ পরিস্থিতি ও মুকাবিলাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় 'বুহ্‌রান' (জ্বরবিকার) বলা হয়। এর মধ্যে কোন দিন 'বুহ্‌রানের চাপ প্রবল থাকে, কোন দিন হালকা। এ জন্য

রোগী এবং তার সেবকদের পক্ষে জ্বর আক্রমণের দিন-তারিখ স্মরণ রাখা উচিত, যেন চিকিৎসককে সঠিক তথ্য দিতে পারে এবং বুহ্‌রানের গতি চিহ্নিত করা তার পক্ষে সহজ হয়। এখন শুধু বই পড়ে রোগী এ বিষয়গুলি কিরূপে নির্বাচন করবে। এটা আদৌ হওয়া সম্ভব নয়। নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি রোগী নিজের চিকিৎসায় নিজে হাত দিলে সাধারণ বিষয়েও মারাত্মক ভুল করে বসবে। কিছুদিন পূর্বে প্রতি বছর বর্ষার শেষ দিকে আমার জ্বর দেখা দিত এবং সবসময় পিত্তজ্বরে ভুগতাম। অবশ্য কয়েক বছর যাবত আল্লাহ্ মাফ করেছেন।

একবার আমি চিন্তা করলাম—আমার পিত্তজ্বর আর হেকিম সাহেব প্রতি বছর প্রায় একই ব্যবস্থা দেন। তাই চল নকল করে রেখে দেই, সময়ে কাজ দিবে। হেকিম সাহেবকেও বারবার কষ্ট দিতে হবে না। তাই একবার আগের বছরের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী কয়েকদিন ঔষধ ব্যবহার করা হলো কিন্তু ফল শূন্য। অবশেষে হেকিম সাহেবকে ডেকে আনলাম। তার ব্যবস্থা মতে কয়েকদিন ঔষধ ব্যবহারে নিরাময় হলো। পরে সন্ধান নিয়ে দেখা গেল এবার পিত্তের সাথে কাশিরও আক্রমণ, বার্ধক্য শুরু হয়েছে কি-না। এখন এটাকেও যদি আগামীবারের জন্য নকল করতাম পিত্ত আর কাশের জোর লক্ষ করে, তাহলে এর দ্বারাও কোন উপকার হবার ছিল না, কাশি বাড়ারই আশংকা ছিল। (বরং بل - غم সংযুক্তির অন্তরালে যার অর্থ "বরং চিন্তা" রোগ যন্ত্রণা বেড়েই যেত, যেহেতু এটা একক শব্দ নয়।) দ্বিতীয়ত এ বছর কাশির পরিমাণ পিত্তের চেয়ে বেশি, সমান না কম এটা অনুমান করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শিরার অবস্থা বুঝে এরূপ চিকিৎসকেরই কাজ এটা। কাজেই বই-পুস্তক পড়ে পড়ে চিকিৎসা করা চিকিৎসকের কাজ। তদ্রূপ "ইহ্ইয়াউল-উলুম", "ফতুহাতে মক্কিয়া" ইত্যাদি তাসাউফের কিতাব বেকার ও অর্থহীন নয়, উপকারী বটে কিন্তু পীরের জন্য, মুরীদের জন্য উপকারী নয়। চিকিৎসার জন্য মুরীদের বরং কোন হক্কানী পীরের আনুগত্য করা অনিবার্য। —আর্ রাগবাতুল-মারগূবাত, পৃষ্ঠা ২১

৯৩. সামষ্টিক কল্যাণ সব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কল্যাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়ার সিদ্ধান্ত ঠিক নহে।

সামষ্টিক কল্যাণ অপেক্ষা ব্যক্তিগত কল্যাণ উত্তম এটাই মূল কথা। কারণ মহানবী (সা)-কে আয়াতে আদেশ দেয়া হয়েছে—গণমুখী ও সামষ্টিক কল্যাণধর্মী দায়িত্ব তথা তাবলীগ থেকে অব্যাহতি লাভের পর ব্যক্তিগত কল্যাণ কাজে আত্মনিয়োগ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতি সর্বাত্মক আকৃষ্ট হওয়ার। বক্তব্যের আনুষঙ্গিকতার

আলোকে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে, বহির্মুখী কল্যাণ অপেক্ষা অন্তর্মুখী কল্যাণ উত্তম-মানের। কারণ প্রথমোক্ত কল্যাণ-কর্ম থেকে অব্যাহতির কামনা প্রকাশ করা হয়েছে শেষোক্ত আমল থেকে নয়। অতপর অন্তর্মুখী কল্যাণধর্মী আমলে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগের নির্দেশ ব্যক্ত করা হয়েছে। এ সময় অন্য কোন দিকে যেন মনোযোগ আকৃষ্ট না হয়। আয়াতে الى ربك (তোমার রবের প্রতি) দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয়।

বলা বাহুল্য, গণমুখী কল্যাণ (نفع متعدى) সর্বাবস্থায় উত্তম হলে তা থেকে অব্যাহতি কোন অবস্থায়ই কাম্য না হয়ে ইরশাদ হতো—

فاذا فرغت من ذكر ربك فانصب فى التبليغ واليه فارغب -

—তোমার রবের যিক্‌র থেকে অবসর হওয়ার পর তাবলীগে আত্মনিয়োগ কর এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ আকর্ষণ নিবদ্ধ রাখ।

উপরন্তু ব্যক্তিগত ও আধ্যাত্মিক কল্যাণে আত্মনিয়োগের সময় বহির্মুখী আমল এড়িয়ে যাওয়ার নির্দেশ ব্যক্ত করা হয়েছে। আয়াতে ক্রিয়ার পূর্বে কর্মের স্থাপন দ্বারা এ অর্থই প্রকাশ পায়। কারণ মূল উদ্দেশ্য কখনো বর্জিত হয় না। অতএব, এর দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আমলের বহির্মুখী প্রচেষ্টা প্রাসঙ্গিক বিষয় আর আধ্যাত্মিক অঙ্গনে আত্মমুখী আমল সৃষ্টিকর্তার মূল উদ্দেশ্য। এ ব্যাখ্যা যদিও প্রচলিত চিন্তাধারার বিপরীত বক্তব্য কিন্তু আসল কথা এটাই। আর প্রচলিত চিন্তার অপর ব্যাখ্যা এ-ও হতে পারে যে, অবস্থা ভেদে সময়ে বহির্মুখী আমল আত্মমুখী আমল অপেক্ষা তাকিদপূর্ণ ও অগ্রাধিকারভিত্তিক হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু এর দ্বারা বস্তুর মৌলিক ফযীলত ও প্রাধান্য অনিবার্য হয় না। বস্তুত সাময়িক প্রয়োজনের তাকীদে হয় তো আপেক্ষিক বিষয়টির ওপর এ উদ্দেশ্যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল যে, বহির্মুখী অমৌলিক আমলের ফলশ্রুতিতে অন্যরা আল্লাহ্‌র প্রতি আকৃষ্ট, ইবাদতে আত্মনিয়োগ এবং নামায-রোযায় লিপ্ত হওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করবে। এ পর্যায়ে কারো সন্দেহ হতে পারে যে, আত্মমুখী কল্যাণ সাধনের পর মানুষ পুনরায় বহির্মুখী আমলের প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে শেষোক্ত আমল সম্ভবত এ জন্যই শরীয়তসিদ্ধ করা হয়েছে। তা এভাবে যে, আত্মশুদ্ধির পর অন্যান্য লোকও তাবলীগ তথা দীন প্রচারের যোগ্যতা অর্জন করে নেবে। এর উত্তর হলো—প্রথমত অন্তর্মুখী আমল এবং আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আত্মকল্যাণ অর্জনের পরই নিজেকে সে তাবলীগের যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে। কারণ যে ব্যক্তি নিজেই শোধনের মুখাপেক্ষী পরকে সে সংশোধন করতে পারে না। দ্বিতীয়ত অন্যদের তাবলীগের যোগ্য হওয়া নিশ্চিত নয়। এ জন্য যে,

কেউ কেউ সংশোধন করার যোগ্যই হয় না। কিন্তু সকলেই আত্মকল্যাণ লাভের যোগ্য পাত্র। কাজেই বহির্মুখী আমলের ওপর আত্মকল্যাণের ফল প্রকাশ নিশ্চিত বিষয় যে এখনই তার বাস্তবায়ন শুরু হয়। অথচ বহির্মুখী কল্যাণের অর্জনক্রিয়া অনিশ্চিত ব্যাপার যে, এ প্রচেষ্টা অন্যদের সংশোধনের যোগ্য হবে কি হবে না। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় শতকরা দুই-একজন মাত্র অন্যকে সংশোধন করার যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়। এখানে প্রশ্ন আরো থাকে—যোগ্য হলেও তা কবে নাগাদ হবে জানা নেই। আর নিজে যোগ্য হল ঠিকই কিন্তু অপরকে সংশোধনের সুযোগ সে পাবে কি না সেও এক সমস্যা। কারণ বহু সালেক (অধ্যাত্ম পথের পথিক) বহির্মুখী আমলের যোগ্যপাত্র হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবে তা কাজে লাগানোর সুযোগ কমই আসে।

অতএব এমন একটা অনিশ্চিত কল্যাণের প্রেক্ষিতে কোন কিছু মৌলিক বিষয়রূপে শরীয়তসম্মত সাব্যস্ত হওয়া অবাস্তব কথা। অবশ্য এটা সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে উদ্দেশ্যমূলক হতে পারে কিন্তু মৌলিক কল্যাণের আমল সেটাই হতে পারে যার বাস্তবায়নও সুফল নিশ্চিত। এ বৈশিষ্ট্য আত্মকল্যাণপ্রসূ আমলেই কেবল লক্ষ্য করা যায় যা বহির্মুখী তথা পরমুখী কল্যাণের ওপর অবিলম্বে প্রতিফলিত হতে শুরু করে। দ্বিতীয়ত কল্যাণ দ্বারা যদি ব্যাপক কল্যাণ উদ্দেশ্য হয়, তবে তালেবের (সাধকের) জন্য এর নিয়ত করা বৈধ হওয়া উচিত। কেননা এমতাবস্থায় তা মাকসুদে (উদ্দিষ্ট বিষয়) পরিণত হয় আর মাকসুদের নিয়তে অগ্রসর হওয়া অনুমোদনযোগ্য এবং তা ক্ষতিকর হতেই পারে না। কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয়ে পারদর্শী মনীষীবৃন্দ যারা এ বিষয়ের মুজতাহিদ, এর নীতি নির্ধারণে যাদের বাক্য-মন্তব্য দলীলরূপে গণ্য হয়, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন—তারা তালেবকে ব্যাপক কল্যাণের (অর্থাৎ অন্যের আত্মশুদ্ধির) নিয়ত করার অনুমতি দেন কি-না। তারা বলেন—তালেব যদি যিক্‌র ও শোগল (ওযীফা) দ্বারা পরের উপকারের নিয়ত করে তবে কখনো সে সফল হতে পারে না। এ জাতীয় নিয়ত করা আধ্যাত্মিক পথের ডাকাতি তুল্য। নিজের আত্মশুদ্ধি সাধনাকালে উদ্দেশ্য কেবল ব্যক্তিগত আত্মসংশোধন এবং আপন আত্মশুদ্ধিরই হওয়া বাঞ্ছনীয়, পরের সংশোধনের উদ্দেশ্য পোষণ করা এ পথে উন্নতির বিরাট অন্তরায় এবং প্রাণনাশী ডাকাত তুল্য। কাজেই যার দরুন নিজের আত্মশুদ্ধির পথ রুদ্ধ হয়ে যায় তার জন্য চেষ্টা করা, তার কামনা করা ডাকাতের প্রতি স্বাগত জানানো ছাড়া আর কি হতে পারে। অতএব বলুন—এমতাবস্থায় অপরের সংশোধনচিন্তা উত্তম এবং মৌলিক উদ্দেশ্য কিরূপে বলা যায়। অধিকন্তু নিজের আত্মশুদ্ধি ও পরিপূর্ণতা অর্জিত হওয়া সত্ত্বেও সবাইকে অন্যের আত্মশুদ্ধির অনুমতি দেয়া হয় না। শায়খের অনুমতি সাপেক্ষেই কেবল কোন ব্যক্তি এ কাজের যোগ্য বিবেচিত হতে পারে। পরের

আত্মশুদ্ধি মূল এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য হলে 'তাকমীল' (পূর্ণতা) অর্জন করার পরও নিজের পক্ষ থেকে পরের আত্মশুদ্ধিতে লিপ্ত হওয়া থেকে কেন বারণ করা হয় এবং শায়খের অনুমোদনের শর্ত কেন যুক্ত করা হয় ? পরের আত্মশুদ্ধি আসল উদ্দেশ্য না হওয়ার এটাও একটা প্রমাণ। অন্যথায় "পরের আত্মশুদ্ধির অনুমতি দেয়া হয় নি"—এ ধরনের প্রতিটি ব্যক্তির অসম্পূর্ণ (ناقص) হওয়া অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। অথচ মাশায়েখদের মতে এটা ভুল কথা। এর ব্যাখ্যায় তাঁরা বলেন—উদ্দিষ্ট পূর্ণতা (كمال مقصود) অর্জন করা পরের ইসলাহের ওপর নির্ভরশীল নয়। আর শায়খের অনুমতির শর্ত আরোপের উদ্দেশ্য হলো—"আমর বিল মা'রূফের" (নেক কাজের আদেশ দান) জন্য কিছু আদব ও যোগ্যতার প্রয়োজন যা অর্জন করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন কারো মধ্যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার অভাব রয়েছে। যার ফলে তার দ্বারা "আমর বিল মা'রূফ" (নেক কাজের আদেশ দান) কল্যাণ বয়ে আনার পরিবর্তে ফিতনা-ফাসাদ ও সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। এ জন্য কোন লোক ব্যক্তিগত পর্যায়ে আত্মশুদ্ধির উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছা সত্ত্বেও তাকে অন্যদের ইরশাদ ও তালকীন অর্থাৎ আত্মশুদ্ধিমূলক উপদেশের মাধ্যমে মানুষের উপকারের অনুমতি দেয়া হয় না। কিন্তু তাই বলে তার ব্যক্তিগত কৃতিত্ব-যোগ্যতা ও কামাল নিষিদ্ধ ও অপূর্ণ হওয়া প্রমাণ করে না। অথচ গণমুখী আত্মশুদ্ধি আসল কাম্য বিষয়রূপে (مقصود بالذات) সাব্যস্ত করার বেলায় ব্যক্তিগত কামাল বা পূর্ণতা নিষিদ্ধ হওয়া অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায় যা 'মুহাক্কিকীনদের ঐকমত্যের পরিপন্থী। দ্বিতীয়ত, আমার প্রশ্ন হলো—পরমুখী আত্মশুদ্ধি মৌল বিষয় (مقصود بالذات) স্বীকার করা হলে কোন 'হরবী' (শত্রু পক্ষীয়) লোক যদি "দারুল হরবে" (কুফরী রাষ্ট্রে) অবস্থানকালে ইসলাম গ্রহণ করে এবং গণমুখী আত্মশুদ্ধি কার্যক্রমে অংশগ্রহণে সঙ্গত কারণেই অক্ষম হয়, এ পরিস্থিতিতে বলুন তার ভূমিকা কি হওয়া উচিত ? সে কি শুধু ব্যক্তিগত আত্মশুদ্ধির গণ্ডিতে নিজেকে সীমিত রাখবে না কি গণশুদ্ধিমূলক কার্যক্রমে অগ্রসর হবে ? এমতাবস্থায় যদি শেষোক্ত কার্যক্রম অনিবার্য করা হয়, তবে মানুষের ক্ষমতার অধিক দায়িত্ব চাপানোর প্রশ্ন এসে পড়ে। আর যদি প্রথমোক্ত বিষয় ওয়াজিব করা হয়, তাহলে পরের আত্মশুদ্ধি মৌলিক বিষয় না হওয়া প্রমাণ হয়। কেননা মৌল বিষয় থেকে কোন মুসলমান বঞ্চিত ও রেহাই পেতে পারে না। এ দীর্ঘ আলোচনার প্রেক্ষাপটে সার কথা এই দাঁড়ায় যে, পরের আত্মশুদ্ধিমূলক কার্যক্রম মৌল উদ্দেশ্য নয় বরং সাময়িক ও আপেক্ষিক বিষয়। আর অনুষঙ্গিক ও আপেক্ষিক বিষয় অপেক্ষা মৌলিক বিষয় উত্তম হওয়া স্বীকৃত কথা।

—আর্ রাগবাতুল মারগুবাহ্, পৃষ্ঠা ৪৬

৯৪. ডুবন্ত অবস্থায় জিবরাঈল (আ) কর্তৃক ফেরাউনের মুখে মাটি চেপে তাকে ঈমান থেকে বিরত রাখা সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব।

এ প্রশ্নের জবাবে আলিমদের অভিমত হলো ঃ

فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوْ بأسنا (আমার আযাব দর্শনের পরবর্তী ঈমান তাদের কোন উপকারে আসবে না) আয়াতের আলোকে জিবরাঈল (আ) জ্ঞাত ছিলেন যে, আযাব দেখার পরবর্তী তওবা গ্রহণযোগ্য নয়। এর দ্বারা প্রকৃত ইসলাম থেকে নয় বরং কপট ইসলাম থেকে বিরত রাখাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। আর এর দ্বারা যদিও আখিরাতে অনুগ্রহ লাভ করা যায় না কিন্তু পার্থিব অনুগ্রহ লাভের সম্ভাবনা বাতিলও করা যায় না। যেমন কপট ইসলামের ছত্রছায়ায় মুনাফিকরা হত্যা ও বন্দী হওয়া থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছিল। তদ্রূপ এভাবে ডুবে যাওয়া ও ধ্বংসের হাত থেকে ফেরাউনের রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা হয় তো ছিল। কারো প্রশ্ন থাকতে পারে যে, আয়াতোক্ত بأسنا দ্বারা পার্থিব আযাব উদ্দেশ্য নয়। কেননা আখিরাতের নিদর্শন দৃষ্ট হওয়ার পূর্বে পার্থিব আযাবের দর্শন ঈমান গৃহীত হওয়ার পরিপন্থী নয়। আর দৃশ্যত এখানে আখিরাতের আযাব প্রকাশিত হয়নি। নতুবা পার্থিব বিষয়ানুভূতির সম্ভাবনা বাতিল সাব্যস্ত হয়। এর জবাব হলো, এ সম্ভাবনা স্বীকৃত নয় বরং আখিরাতের নিদর্শন প্রকাশ পাওয়ার পরও পার্থিব অনুভূতি থাকা সম্ভব। সুতরাং কোন কোন মরণোন্মুখ ব্যক্তির ঘটনা দ্বারা জানা যায় যে, তারা ফেরেশতা দেখতে পেয়েছেন সাথে সাথে বাড়ির মহিলাদেরও চিনতে পেরে তাদের বলেছেন, ফেরেশতা বসা আছেন এদের থেকে তোমরা পর্দা কর। সুতরাং আখিরাত প্রকাশের প্রাথমিক অবস্থায় জাগতিক বিষয়ের চেতনা বহাল থাকা অসম্ভব নয়। ফিরআউনের ঘটনা তাই প্রমাণ করে যে, তার ঈমান প্রকাশের সময় আখিরাতের দৃশ্য স্পষ্ট হওয়ার কালে জাগতিক বিষয়-চেতনাও তার যথারীতি বহাল ছিল। সুতরাং তার—امت بالذى امنت به بنو اسرائيل (বনি ইসরাঈল যার প্রতি ঈমান এনেছে সেই মহান সত্তার প্রতি আমিও বিশ্বাস স্থাপন করলাম) উক্তি প্রমাণ করে যে, বনি ইসরাঈল তখন সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং তাদের ঈমানদার হওয়া তার অনুভূতিতে জাগ্রত ছিল। এটা তো পার্থিব ঘটনা। তাহলে আখিরাতের চেতনা তার অবশ্যই কায়েম ছিল বলে ধারণা করার সঙ্গত কারণ বিদ্যমান রয়েছে। উপরের ঘটনা দ্বারা বোঝা যায় পার্থিব অনুভূতি ও আখিরাতের আযাবের মধ্যে সমন্বয় অসম্ভব কিছু নয়। সুতরাং আলোচ্য প্রমাণের ভিত্তিতে পরকালীন আযাব নিষিদ্ধ হতে পারে না আর আলামতের এ জাতীয় প্রকাশ ঈমান কবূল হওয়ার পরিপন্থী। এখন রইল অপর প্রশ্ন যে, এ অবস্থা যখন ঈমান কবূল

হওয়ার পরিপন্থী আর ঈমান বলা হয় অন্তরের বিশ্বাসকে, অধিকন্তু পরকালীন আযাব পরিদৃষ্ট হওয়ার পর মৌখিক উচ্চারণ সত্ত্বেও তা গ্রহণযোগ্য নয় এমতাবস্থায় ঈমানের উচ্চারণ নিষিদ্ধ হওয়াতেই বা লাভ কি ? তদুপরি মৌখিক স্বীকৃতির কোনও উপকার মেনে নেয়া অবস্থায় কারণবশত অক্ষমতার দরুন মৌখিক স্বীকৃতি দানের আন্তরিক নিয়ত যথেষ্ট হওয়া উচিত এবং কাদা চাপা দ্বারা এখানে অক্ষমতা আর নিয়তভিত্তিক স্বীকৃতি প্রমাণ হয়। ফলে ফিরআউনের মুখে কাদা মাটি চাপা দেয়াতে লাভ কি ? এরও একই জবাব যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তার প্রতি বাহ্যিক অনুগ্রহও জিবরাঈল (আ)-এর মনঃপূত ছিল না, যদিও ফিরআউনের লাশের হিফাযতের মাধ্যমে এক প্রকার বাহ্যিক অনুগ্রহ করা হয়েছিল। যথা فليوم ننجيك ببدنك (আজ তোমার দেহটি আমি সংরক্ষণ করব) আয়াত তাই প্রমাণ করে। কিন্তু এখানেও প্রশ্ন জাগে—এ বাহ্যিক অনুগ্রহের দরুন জিবরাঈল (আ)-এর অসুবিধা কি ছিল, তাঁর আপত্তি হলো কেন ? এরও একই জবাব যা আমি উল্লেখ করছিলাম যে, জিবরাঈল (আ)-এর আচরণের মূলে "আল্লাহ্‌র জন্য শত্রুতা" এ মানসিকতার প্রভাব সক্রিয় ছিল, যে জন্য এটুকুও তাঁর সহ্য হয়নি। বস্তুত খোদার অভিশপ্তের প্রতি এহেন শত্রুতা আল্লাহ্‌র সাথে গভীর ভালবাসার পরিচায়ক। —আল-ঈদ ওয়াল ওয়াঈদ, পৃষ্ঠা ১০

৯৫. কোন বিষয়ে আল্লাহ্‌র ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা ঐ বিষয়টির এখতিয়ার বহির্ভূত হওয়া অনিবার্য হয় না।

একাধিক পর্যায়ে বিন্যস্ত এ সম্পর্কিত প্রমাণ আমার হাতে বিদ্যমান। প্রথম বিন্যাস ঃ অর্থহীন কাজ থেকে মহান আল্লাহ্ পবিত্র। দ্বিতীয় বিন্যাস ঃ রোগ নিরাময়ে নৈরাশ্যের পর বিজ্ঞ চিকিৎসক একে তো ঔষধই দেয় না, তৃতীয়ত ঔষধ দিলেও তা ব্যবহারে রোগীকে পীড়াপীড়ি করে না। কেউ কেউ বরং পরিষ্কার বলেই দেয় যে, রোগীর আয়ু শেষ, ঔষধ বেকার। এ পরিস্থিতিতে কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক ঔষধ দিলেও তা এ জন্য যে, গায়বের খবর তার অজানা। চিকিৎসাশাস্ত্রের নিয়মানুসারে এ রোগ চিকিৎসার ঊর্ধ্বে ধারণা হলেও এটা তার অভিজ্ঞতা প্রসূত ধারণা মাত্র, নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নয়। আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতার ভরসায় তিনি আশাবাদীও। যেমন কবি বলেছেন ঃ

عقل در اسباب میدارد نظر
عشق می گوید مسبب رانگر

—মানুষের জ্ঞান কেবল উপায়-উপকরণের দৃষ্টিতে বিবেচনা করে কিন্তু ভালবাসার নির্দেশ হলো—উপকরণের সৃষ্টিকর্তাকে লক্ষ কর।

বস্তুত গায়বের মালিক আল্লাহ্‌র বাণী— ختم الله على قلوبهم (আল্লাহ্ তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন)-এর দরুন তারা চিকিৎসার অযোগ্য এবং এটা তাদের ক্ষমতার বাইরে প্রমাণিত হলে সেটা আলিমুল গায়বের কালাম হিসেবে অকাট্য ও নির্ভুল হওয়া অনিবার্য ছিল। অধিকন্তু ইখতিয়ার নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে ঔষধ গ্রহণে বাধ্য করা সম্ভব ছিল না। কেননা তা لا يكلف الله نفسا الا وسعها (অর্থাৎ ক্ষমতার অধিক কোন কিছু কারো উপর চাপানো আল্লাহ্‌র নীতি নয়) আয়াতের মর্মবিরোধী কথা। তৃতীয়ত আল্লাহ্ তাদের ওপর ঔষধ গ্রহণ করা অনিবার্য করে দিয়েছেন। কেননা يا ايها الناس اعبدوا ربكم (হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত-আনুগত্য কর) আয়াত ব্যাপকার্থবোধক সম্বোধন এবং আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। তদুপরি يا ايها الناس দ্বারা সমস্ত কাফিরের প্রতি ঈমান গ্রহণের নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে। যাতে ختم الله على قلوبهم-এর উদ্দিষ্ট কাফিররা পর্যন্ত শামিল। অধিকন্তু এ মর্মে 'ইজমা' বা সর্বসম্মত ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, আবূ জেহল, আবূ লাহাব প্রভৃতি কাফির যদি ঈমান আনার আদেশের অন্তর্ভুক্ত না থাকে এবং এ হুকুম থেকে খারিজ সাব্যস্ত হয়, তবে তাদের ওপর আযাব হওয়ার যৌক্তিকতা খর্ব হয়। কারণ তাদের পক্ষ থেকে সঙ্গত আবেদনের অবকাশ সৃষ্টি হয় যে, হুযূর, কুফরী ও ঈমান বর্জনের অপরাধে আমরা আযাবে গ্রেফতার হওয়া অযৌক্তিক। কেননা শেষের দিকে আপনার পক্ষ থেকে ختم الله على قلوبهم নাযিল করার ফলে আমরা ঈমানের হুকুমের অন্তর্ভুক্তই ছিলাম না। অথচ তাদের আযাবের যথার্থতা ختم الله -এর পরেই ولهم عذاب عظيم (তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি) 'নস' (কুরআনের আয়াত) দ্বারা প্রমাণিত। অতএব মানতেই হবে যে, ختم الله على قلوبهم-এর মর্মাধীন কাফিররাও ঈমানের হুকুমের আওতাভুক্ত। সুতরাং আমার দাবি ختم الله على قلوبهم -এর সাথে সংশ্লিষ্ট কাফিরদের রূহানী ব্যাধি চিকিৎসাবহির্ভূত ছিল না" যথার্থ প্রমাণ হয়ে গেল। রূহানী চিকিৎসাকেন্দ্রে কারো চিকিৎসা অসাধ্য হলে তারাই ছিল তার যোগ্য পাত্র। কিন্তু তারা তদ্রূপ ছিল না। তাই প্রমাণ হলো যে, এমন কোন রূহানী ব্যাধির অস্তিত্ব লক্ষ করা যায় না যা চিকিৎসার ঊর্ধ্বে। প্রশ্ন হতে পারে—তা হলে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রয়োজন কি ছিল ? জবাব হলো—আল্লাহ্‌পাক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছিলেন, যার সারমর্ম ছিল— لا يؤمن ابو جهل و نحوه مع بقاء اختياره —আবূ জেহেল ও অন্যান্য কাফির নিজের ইখতিয়ার বলেই ঈমান থেকে

বিরত থাকবে। উদ্দেশ্য এই নয় যে, ঈমান আনার শক্তি ও ক্ষমতাই তাদের থাকবে না। উত্তমরূপে বুঝুন। এ বিষয়ে অধিক আলোচনা তকদীর সম্পর্কে নিষিদ্ধ আলোচনার পর্যায়ভুক্ত।

মোট কথা—আলোচনার প্রেক্ষাপটে প্রমাণ হলো যে, নস দ্বারা কোন বিষয়ের ভবিষ্যদ্বাণীর দরুন—বিষয়টি ইখতিয়ার বহির্ভূত হওয়া অনিবার্য হয় না। অতএব এর তদবীর এবং অর্জনের প্রচেষ্টা অর্থহীন নয়। নতুবা ভবিষ্যদ্বাণী তদবীরের অন্তরায় স্বীকার করা হলে আজ থেকে কুরআন শরীফ হিফজ করা বর্জিত হওয়া উচিত। কেননা انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون (কুরআন আমিই নাযিল করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষণের ব্যবস্থা করব।) আয়াতে এই মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কুরআনের সংরক্ষণ স্বয়ং আল্লাহ্‌র দায়িত্বে, এটা তাঁর ওয়াদা। তাহলে আল্লাহ্ না করুন কুরআনের পঠন, লিখন, মুদ্রণ বর্জন করা উচিত। আর মুদ্রিত সকল কপি দাফন করে আল্লাহ্ হাফেজ বলা উচিত। এর একজন হাফেজই যথেষ্ট, যে ক্ষেত্রে নিজে তিনি কুরআনের সংরক্ষণকারীও। وانا له لحافظون আয়াতের মর্মানুসারে কুরআনের সংরক্ষণকল্পে যাবতীয় উপায়-উপকরণ তাঁর আয়ত্তে এবং এসবের যথাযোগ্য ব্যবহার তিনি করেই নেবেন। কিন্তু আজো পর্যন্ত মুসলিম জাতি এ পথ ধরেনি। অথচ এখানেও ভবিষ্যদ্বাণীর বর্ণনা। তাহলে এক্ষেত্রে কুরআন শরীফ হিফজকরণ, লিখন ও মুদ্রণ সবকিছু নিজের ওপর ফরয মনে করার কি অর্থ ? আর কারো সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী হয়ে যাওয়ার পর এখন চিকিৎসার কি প্রয়োজন ? আমি বলি—আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কুরআনের হিফাজতের ওয়াদা ব্যক্ত করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে আপনার হিফাজতের দরকার কি ? এর সংরক্ষণ ব্যবস্থায় আপনারা এত ব্যস্ত কেন ? তাহলে আপনাদের বিরুদ্ধেও একই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যা আপনারা করে থাকেন। এ দুইয়ের পার্থক্য এবং তার কারণ ব্যাখ্যা করুন। বেশ, আপনারা বলতে কুণ্ঠিত হলে চলুন আমিই জবাব বলে দেই। জবাবে আপনারা বলতে পারেন যে, وانا له لحافظون -এর অর্থ প্রত্যেক যুগে আমি এমন উৎসাহী লোক সৃষ্টি করবো যারা কুরআন সংরক্ষণে তৎপর থাকবেন। তাদের জন্য চিন্তার এমন পদ্ধতি উদ্ভাবন করে দেব যার অবলম্বনে তারা লিখবে, পড়াবে এবং এভাবে আল্লাহ্‌র কুরআন হিফাজতের ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে। তদ্রূপ আপনাদের অবাধ্যতার প্রভাব ও ভবিষ্যদ্বাণীর পিছনে কার্যকর। এখন ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ হবে—স্বেচ্ছায় সীমালংঘনের দরুন মানুষ এহেন ধ্বংস ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। সুতরাং আল্লাহ্ ও রাসূল কর্তৃক কোন কিছুর আগাম সংবাদ দ্বারা তা হুকুম বিধানের আওতামুক্ত থাকার অনিবার্যতা এবং ব্যবস্থাপনা বহির্ভূত

হওয়ার কথা প্রমাণ করে না। এর রহস্য প্রারম্ভে আমি এই উল্লেখ করেছিলাম যে, ভবিষ্যদ্বাণী কখনো হয় রোগ চিকিৎসার আয়ত্তের বাইরে যাওয়ার দরুন আবার কখনো রোগীর কুপথ্য গ্রহণের করণে। বলা বাহুল্য—রূহানী ব্যাধির কোনটাই চিকিৎসার উর্ধ্বে নয়। সুতরাং এখানকার যাবতীয় ভবিষ্যদ্বাণী বান্দা কর্তৃক গৃহীত কু-পথ্যের অন্তরালে নিহিত। —আল-ইনসিদাদ, পৃষ্ঠা ৮

৯৬. অধিক বিজয়ের দরুন ফারূকী শাসনামলকে সিদ্দিকী শাসনকাল অপেক্ষা উত্তম মনে করা ভুল।

হযরত আবূবকর (রা)-এর খিলাফতকালে তেমন উল্লেখযোগ্য বিজয় সূচিত হয়নি বরং জাতীয় নিরাপত্তামূলক কাজে তাঁর শাসনামলের অধিক সময় ব্যয় হয়। মহানবী (সা)-এর ইন্তিকালের পর কোন কোন সম্প্রদায় ইসলাম ত্যাগ করে কিছু লোক যাকাতের ফরয অস্বীকার করে বসে। এ ধরনের এক বিশৃংখল ও ইসলাম ত্যাগের ফিৎনা দমন করতে মুসলমানদের সামলানো কাজেই তাঁর খিলাফতকালের পূর্ণ সময় ব্যয়িত হয়। সুতরাং বিজয়ের সুযোগ তাঁর হাতে আসেনি। পক্ষান্তরে হযরত উমর (রা)-এর শাসনামলের প্রায় প্রতিদিন কোন না কোন বিজয়বার্তা মদীনায় পৌঁছত। প্রতিদিন সংবাদ আসত আজ অমুক শহর মুসলিম বাহিনীর পদানত হয়েছে, কাল অমুক শহরে অভিযান ইত্যাদি। এমনিভাবে ফারূকী শাসনের দশ বছর কালের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের বিশাল ভূ-খণ্ডে ইসলামী হুকুমতের পরিধি বিস্তৃত হয়। কোন কোন অর্বাচীন বিজয়ের অব্যাহত এ-গতিধারা লক্ষ করে তাঁর খিলাফতকাল খিলাফতে সিদ্দিকীয়া অপেক্ষা সার্থক ধারণা করে। কিন্তু বিবেকবানের নিকট স্পষ্ট যে, ভবন ইত্যাদির নির্মাণ সৌকর্য ও নিপুণ শিল্পকর্মের কৃতিত্ব পরিকল্পনাকারী প্রকৌশলীর, যিনি পরিকল্পনা ও নকশা তৈরি করে ভিত্তি স্থাপন করেন। যেহেতু তার পূর্ণ মেধাশক্তি এর পেছনে ব্যয়িত হয়েছে। ইমারতের নির্ভুল নকশা তৈরি করা এবং ভিত্তি মজবুত করাই আসল কাজ। ইটের উপর ইট গেঁথে দেয়াল দাঁড় করানো অপেক্ষাকৃত কম কৃতিত্বের কাজ। স্থূলদর্শী লোকেরা নির্মাণ সমাপ্তির দরুন দ্বিতীয়-জনের কৃতিত্বের দাবিদার। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি মাত্রেরই জানা যে, বাড়ির সৌন্দর্য ও মজবুতীর কৃতিত্ব নকশাকার-ভিত্তি স্থাপনকারীর। তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানী মনীষীবৃন্দের দৃষ্টিতে খিলাফতে সিদ্দিকীয়ার সাথে খিলাফতে ফারূকিয়ার কোন সামঞ্জস্যই হতে পারে না। কারণ ইসলামী হুকুমাত ও খিলাফতের বুনিয়াদ স্থাপনের পিছনে যে শ্রম ও মানসিক চিন্তা ক্ষয় করতে হয়েছে তার দশ ভাগের এক ভাগও হযরত উমর (রা)-কে করতে হয়নি। সে সিংহহৃদয় খলীফার শাসনকালে স্বজাতীয়দের ইসলাম ত্যাগ, ইসলামের

অন্যতম স্তম্ভ যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতির ন্যায় ফিৎনা-ফাসাদ মাথাচাড়া দিলে অকুতোভয়ে সার্থক মুকাবিলা দ্বারা তিনি এসব নির্মূল করে শাসনের মাত্র আড়াই বছরের মেয়াদে ইসলামী হুকুমতের ভিত মজবুত করে তা এমন সুষ্ঠু নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন যে, পরবর্তী খলীফার জন্য পথ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং হযরত সিদ্দীক (রা)-এর কৃতিত্ব এক্ষেত্রে মুখ্য। হযরত উমর (রা)-এর শাসনামলে সূচিত যাবতীয় বিজয়ের সমস্ত সওয়াব হযরত সিদ্দিকের আমলনামায় যুক্ত হবে। যেহেতু তাঁর প্রবর্তিত নীতির ওপরই খিলাফতে উমর (রা)-এর প্রবাহ বইতে থাকে। সংস্কৃতিবান ও রাজনৈতিক দূরদর্শী ব্যক্তির জানা কথা যে, প্রয়োগ অপেক্ষা আইন প্রণয়ন কঠিন ব্যাপার। কেননা আইন প্রয়োগকারীর পক্ষে প্রণয়নকারীর দশ ভাগের এক ভাগ শ্রমও ব্যয়ের প্রয়োজন পড়ে না।

—আল-জালালিল-ইব্‌তিলা, পৃষ্ঠা ৯

৯৭. "চার শ বছর পর ইজতিহাদ থাকবে না" কথাটির অর্থ।

এর অর্থ এই নয় যে, চারশ বছর পর ইজতিহাদযোগ্য মেধা দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে। একে তো এটা প্রমাণহীন কথা, দ্বিতীয়ত এ অর্থ শুদ্ধও হতে পারে না। কারণ প্রত্যেক যুগে খুঁটিনাটি এমন সব নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটে ইমামগণ থেকে যার কোন সমাধান বর্ণিত নেই। সমকালীন আলিমগণ নিজেদের ইজতিহাদের আলোকে এসবের সমাধান দিয়ে থাকেন। ইজতিহাদের অধ্যায় যদি চিরতরে খতম হয়ে যায় অধিকন্তু ইজতিহাদযোগ্য মেধা দুর্লভ হয়ে পড়ে, তাহলে কি শরীয়ত তার সমাধান দিতে অক্ষম হয়ে পড়বে কিংবা আকাশ থেকে নতুন নবী আবির্ভূত হবেন উদ্ভূত মাসআলার সমাধান দিতে ? আল্লাহ্ না করুন যদি তাই হয়, তবে ক, দ, ন, (ق - د - ن) অর্থাৎ কাদিয়ানী) সম্প্রদায়ের কানে এর আভাস পৌঁছে গেলে মাসীহে মাওউদের (প্রতিশ্রুত মাসীহ) নবুয়ত সিদ্ধকারী প্রমাণের তালিকায় আরো একটি দলীল যুক্ত হবে। তাহলে—اليوم اكملت لكم دينكم (আজ তোমাদের দীনকে আমি পূর্ণতা দান করলাম) আয়াতের মর্ম কি হবে ? আয়াত ঘোষণা করছে দীনের পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটেছে। যদি ইজতিহাদের দ্বার রুদ্ধ হওয়া স্বীকার করা হয়, তাহলে শরীয়তের সে পূর্ণতার পথ কি? অথচ নতুন নতুন এমন সব মাসআলা রয়েছে ফিকার গ্রন্থ কিংবা মুজতাহিদগণের ব্যাখ্যায় যার কোন সমাধান বর্ণিত নেই। সম্প্রতি প্রশ্ন উঠেছে উড়োজাহাজে নামায পড়া জায়েয কি-না ? চার শতাব্দীর পর ইজতিহাদের বৈধতা সম্পূর্ণত অস্বীকার করা হলে শরীয়ত এ প্রশ্নের কি জবাব দেবে ? পূর্বে বিমানের অস্তিত্ব-ই ছিল না, ফকীহগণের পক্ষ থেকে তাই এই সম্পর্কে কোন বিধানও বর্ণিত নেই। তাই

আমাদেরকেই ইজতিহাদের মাধ্যমে এ জাতীয় নতুন সমস্যার সমাধান ব্যক্ত করতে হয়। ফকীহ্‌গণের মন্তব্যের উদ্দেশ্য এই নয় যে, চার শতাব্দীর পর ইজতিহাদের দ্বার পৌনপুনিক রুদ্ধ হয়ে গেছে বরং উদ্দেশ্য এই যে, 'উসুল' (মূলনীতি) সম্পর্কিত ইজতিহাদের দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ কিন্তু শাখাভিত্তিক ইজতিহাদ এখনো বাকি এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা চালু থাকবে। আর শাখাকেন্দ্রিক ইজতিহাদের বৈধতা স্বীকৃত না হলে শরীয়তের পূর্ণতায় অমূলক সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়। অথচ ইসলামী শরীয়তের সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান বিবৃত রয়েছে। ফিকাহ্ গ্রন্থসমূহে খুঁটিনাটি-ছোটখাট মাসআলার বিবরণ না থাকতে পারে কিন্তু মুজতাহিদগণ মূলনীতি এমনভাবে প্রণয়ন ও নির্ধারণ করেছেন যার আলোকে কিয়ামত পর্যন্ত সমকালীন আলিমগণ নবউত্থিত যেকোন সমস্যার সমাধান ব্যক্ত করতে সক্ষম হবেন। তবে হ্যাঁ, কুরআন-হাদীস মন্থন করে 'উসূল' তথা মূল নীতি উদ্ভাবন করা বর্তমানে সম্ভব নয়। এটা মূলত নীতিগত ইজতিহাদ চার শতাব্দী পর যার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। কেননা প্রথমত মুজতাহিদগণ যাবতীয় মূলনীতি ব্যাখ্যা করেছেন, কোন একটা দিকও তাঁরা অপূর্ণ রাখেন নি। দ্বিতীয়ত পরবর্তী যুগের কোন ইমাম কোন বিষয়ে মূলনীতি উদ্ভাবন করলেও সেটা সার্বিক নয়, কোন না কোন এক পর্যায়ে তাতে জটিলতা দেখা দিবেই। তাই বোঝা গেল মূলনীতিকেন্দ্রিক ইজতিহাদযোগ্য মেধা পরবর্তীকালে দুর্লভ হয়ে গেছে। বস্তুত সেটা মুজতাহিদগণের বিশেষত্ব ছিল যে, 'নস' থেকে তাঁরা এমন নিখুঁত আকারে মূলনীতি উদ্ভাবন করেছেন যার কোন এক পর্যায়ে বিন্দুমাত্র জটিলতা পরিলক্ষিত হবার নয়। শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ (র) এক স্থানে লিখেছেন—হিদায়ার গ্রন্থকার কর্তৃক উদ্ভাবিত উসূলে (মূলনীতি) নির্ভরযোগ্য নয়। এ কথার অর্থ এটা নয় যে, হিদায়া নির্ভরযোগ্য কিতাব নয় এবং এর উসূল ত্রুটিযুক্ত। বরং শাহ্ সাহেবের উদ্দেশ্য হলো—হিদায়ার গ্রন্থকার কোন কোন উসূল ঊর্ধ্বতনের বরাতে উদ্ধৃত না করে কুরআন-হাদীস থেকে নিজে সরাসরি উদ্ভাবন করেছেন। তাঁর এইটুকু কেবল নির্ভরহীন। কিন্তু তাঁর খুঁটিনাটি শাখাগত যাবতীয় মাসআলা নির্ভরযোগ্য। অতএব লক্ষণীয় যে, হিদায়ার গ্রন্থকার একজন সূক্ষ্মদর্শী, অগাধ জ্ঞানের অধিকারী, ফিকাহ্-শাস্ত্রের অন্যতম ব্যাখ্যাকার। তাঁর সংকলিত প্রামাণ্য গ্রন্থ বিশ্ববিখ্যাত হিদায়া কিতাব ফিকার আকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। এতে তিনি যুক্তি ও প্রমাণ (نقلی و عقلی) দু-ধরনের দলীলের মাধ্যমে প্রতিটি মাসআলা প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। তাঁর অপরিসীম জ্ঞানের জ্বলন্ত স্বাক্ষর লক্ষ করা যায় প্রতিটি মাসআলার শাখা-প্রশাখা (جزئيات) সম্পর্কে হাদীস বর্ণনার অতুল ভঙ্গিমায়। যদিও তিনি হাদীস এনেছেন

সনদ-বিহীন কিন্তু সন্ধান নিলে দেখা যাবে মুসনাদ-বায্যার, মুসনাদ আবদুর রাজ্জাক, বায়হাকী অথবা মুসান্নাফ ইবনে আবূ শাইবাহ্ ইত্যাদি যেকোন গ্রন্থে তার সূত্র অবশ্যই বিদ্যমান। অবশ্য দু-একটির ক্ষেত্রে আমাদের সন্ধানী দৃষ্টি পৌঁছতে না পারার দরুন সেগুলি সূত্রহীন সাব্যস্ত হয় না। এ হলো তাঁর জ্ঞান গভীরতার অবস্থা। প্রজ্ঞার দিক বিবেচনা করলে প্রথম প্রতিপক্ষের দলীল ও জবাব এবং পরে স্বীয় মাযহাবের দলীল পেশ করা তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও সরাসরি কুরআন ও হাদীস থেকে মূলনীতি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে হিদায়া সম্পর্কে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত হলো—হিদায়া গ্রন্থকারের উদ্ভাবিত 'উসূল' (মূলনীতি) নির্ভরযোগ্য ও স্বীকৃত নয়; যেহেতু যে কোনও এক স্তরে এতে জটিলতা সৃষ্টি হয়-ই। অতএব সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও প্রজ্ঞায় হিদায়া গ্রন্থকারের সাথে আজকাল যাঁদের দূরতম সম্পর্কও নেই হাদীস-কুরআন থেকে তারা কি মূলনীতি উদ্ভাবন করবে। অবশ্য খুঁটিনাটি ইজতিহাদ (اجتهاد فى الفروع) এখনো বৈধ। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, আমরাও ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম শাফিঈর ন্যায় মুজতাহিদ হয়ে যাব। রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি উত্তমরূপে জ্ঞাত আছেন যে, আইন প্রয়োগ অপেক্ষা আইন প্রণয়ন অধিকতর জটিল ও দুরূহ কাজ। তাঁদের উদ্ভাবিত উসূলের ভিত্তিতে ফতোয়া জারি করা ভিন্ন আমাদের করণীয় কি আছে। যারা কুরআন-হাদীস পর্যালোচনা করত এমন সব নীতিমালা নির্ধারণ করেছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত আনুষঙ্গিক ও খুঁটিনাটি মাসআলা সমাধানের জন্য যথেষ্ট, মূলত সে সকল মনীষীই কৃতিত্বের দাবিদার। এমন কোন মাসআলা জাতীয় সমস্যার উদ্ভব হতে পারে না যার বৈধতা-অবৈধতার হুকুম উক্ত মূলনীতির আলোকে সমাধান করা না যায়। অধিকন্তু তাঁরা কেবল নীতিমালাই নয় আনুষঙ্গিক মাসআলাও এত অধিক পরিমাণ উদ্ভাবন করেছেন যে, সরাসরি কিংবা ইঙ্গিতে ব্যাখ্যা-বর্ণনা করেন নি এমন মাসআলা কমই পাওয়া যাবে। কদাচিৎ যদি কোথাও দেখা যায় যে, ইমামগণ দু-একটি মাসআলার বর্ণনা এড়িয়ে গেছেন, তাহলে বুঝতে হবে হয়তো মুফতী সাহেবের দৃষ্টি এর সমাধানের গভীরে পৌঁছেনি অথবা ইবারতে (বাক্য) সমাধান রয়েছে ঠিকই কিন্তু প্রজ্ঞার অভাবে তিনি তা লুফে নিতে পারেননি। আর যদি ধরেও নেয়া হয় যে, খুঁটিনাটি বা ছোটখাট মাসআলা তাঁরা এড়িয়ে গেছেন কিন্তু তাঁদের উদ্ভাবিত নীতিমালা রয়েছে যার আলোকে সমাধান বের করা যায়। মোট কথা, মুজতাহিদ ইমামগণের সমকক্ষতা দাবি করার মত বুকের পাটা আজকাল কারো থাকতে পারে না।

—আল-জালালিল ইবতিলা, পৃষ্ঠা ১০

৯৮. সাদৃশ জ্ঞান (علم الاعتبار) তুলনামূলক পর্যায়ের বিষয় কুরআনকেন্দ্রিক জ্ঞান (علوم قران) নহে।

বুযুর্গানে দীন কর্তৃক কুরআনের আলোকে উদ্ভাবিত ভিন্ন প্রকৃতির 'ইল্‌ম' (জ্ঞান) কুরআন দ্বারা প্রমাণিত কিংবা কুরআন কেন্দ্রিক 'ইল্‌ম' নয়, বরং একে 'কুরআন সদৃশ ইল্‌ম' আখ্যা দেয়া যায়। বস্তুত 'কুরআন কেন্দ্রিক' এবং 'কুরআন সদৃশ' (مدلول قرآن এবং منطبق على القرآن) এ-দুইয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান। একটা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টা পরিষ্কার হতে পারে। মনে করুন এক ব্যক্তির নিকট ক্ষৌরকার এসে বলল, "চুল ছাঁটিয়ে নিন।" জবাবে সে বলল "বড় হতে দাও"। তার এ জবাবদানকালে তারই কন্যার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে পাত্রপক্ষের বার্তাবাহক চিঠি হাতে ঘটনাক্রমে সেখানে উপস্থিত হয়। এখন সেও যদি "বড় হতে দাও" উক্তিটাকে নিজের আনীত পত্রের জবাব ধরে নেয়, তবে তা উভয়ের উত্তর হতে পারে। ক্ষৌরকারের জবাব এভাবে যে, চুল আরো বড় হতে দাও, বড় হলে তখন ছাঁটাব। আর বার্তাবাহকের উত্তর এ প্রকারে যে, মেয়ে তো এখনো ছোট, বড় হোক, তখন বিয়ের প্রশ্ন। এক্ষেত্রে বক্তার মূল উদ্দেশ্য ছিল ক্ষৌরকারের জবাব দেয়া। কিন্তু বাক্যের প্রকৃতি এমন যে, এর দ্বারা বার্তাবাহকের জবাবও চিহ্নিত হতে পারে। এটাকে সূক্ষ্ম বাকরীতি বলতে পারেন। অতএব প্রথমটিকে বলা হয় বাক্যের মূল বক্তব্য আর দ্বিতীয়টি এর সাথে সদৃশ মাত্র। এক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, সূফীগণ اذهب الى فرعون انه طغى (হে মূসা! তুমি ফিরাউনের নিকট যাও, সে সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ি করেছে) আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর-সদৃশ ভঙ্গিতে বলেছেন ঃ এর অর্থ— اذهب ايها الروح الى النفس انه طغى واذبحوا بقرة النفس [হে রূহ! তুমি নফসের (কু-প্রবৃত্তির) প্রতি গমন কর, সে সীমা লংঘন করেছে। এবং তোমরা নফসের পশু যবাই কর]। অতপর আয়াতের এসব রূপক তরজমা লক্ষ করে মানুষ দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল সূফীগণের প্রতি অনুরাগ-শূন্য, যারা কেবল নসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণের পক্ষপাতী। এ সমস্ত 'তাবীল' (রূপক অর্থ) সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তারা বলেছেন ঃ কোথায় ফিরাউন আর কোথায় নফ্‌স, কোথায় রইলেন মূসা আর কোথায় রূহ্। এ দুইয়ের মধ্যে কি সম্পর্ক ? এ-তো যেমন যমীন বলে আকাশ অর্থ করার নামান্তর। এ কারণে তারা সূফীগণকে পথভ্রষ্ট ও কুরআন বিকৃতকারী আখ্যা দিয়ে সূফীমতের অস্বীকার করে বসে। ফলে এদের সমূহ ক্ষতি এই হলো যে, ওয়ালী আল্লাহ্‌গণের ফয়েয ও বরকত থেকে তারা বঞ্চিত রয়ে গেল। দ্বিতীয়পক্ষ যারা সূফীপ্রেমে আত্মহারা

হয়ে বলা শুরু করে—কুরআনের মূল বক্তব্য ও ব্যাখ্যা এটাই (যা সূফীগণ ব্যক্ত করেছেন), এতে সব বাতেনী কথাবার্তা কিন্তু যাহেরী আলিমগণের পক্ষে এসব ধরা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে অবিমৃষ্যকারীদের বাড়াবাড়ি এ পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, তারা কুরআন পাকের বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছে। কসম খোদার, এরা ধ্বংস হয়ে গেছে। আল্লাহ্‌র কসম! কুরআনের বক্তব্য আদৌ এরূপ নয়। এর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, নামায-রোযা সব বিলীন হওয়ার পথে। কেননা সমস্ত 'নস' বরং শরীয়তের ভাবমূর্তিকে এরা পরিবর্তন করে দিয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আলোচনা এদের নিয়ে নয় বরং পর্যালোচনা হলো—সূফীগণের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সম্পর্কে। বলা বাহুল্য—ইতিপূর্বে আলোচ্য দুই পক্ষের এক পক্ষ তো সূফীগণের অপর দল মুফাস্‌সীরগণের ব্যাখ্যা অস্বীকার করে বসেছে। মাঝপথে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা যারা কুরআনকে 'কালামুল্লাহ্' এবং সূফীগণকে 'আহ্‌লুল্লাহ্' রূপে ভক্তি করি। অতএব উভয়পক্ষের সহায়তা ও সমর্থন সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রয়োজন হলো—এসব ব্যাখ্যার এমন অর্থ গ্রহণ করা যাতে কালামুল্লাহ্‌র বিন্দুমাত্র পরিবর্তন সূচিত না হয় এবং আহলুল্লাহগণের উক্তিও শরীয়তের বিপক্ষে না যায়। তাই আমরা বলি—আয়াতের সূফীগণের বর্ণিত অর্থ প্রকৃতপক্ষে তাফসীর পর্যায়ের নয় আর তাঁরা আয়াতের বাহ্যিক বক্তব্য অস্বীকারও করেন না। তাঁদের উদ্দেশ্য কখনো এরূপ নয় যে, কুরআনে বর্ণিত ফিরাউন দ্বারা প্রকৃত নফ্‌স, মূসা অর্থ রূহ এবং বাকারা অর্থ নফ্‌স। এ পর্যায়ে তাঁরা যা কিছু ব্যাখ্যা-মন্তব্য ব্যক্ত করেন সেটাকে আসলে "ইলমে ইতিবার" (علم اعتبار -তুলনীয় জ্ঞান) বলা হয়। বস্তুত নিজের অবস্থাকে পরের অবস্থার সাথে তুলনামূলক বিচার করাই হলো "ইলমে ইতিবারের" মূল দর্শন। এর উপমা দিয়ে কথাটা এভাবে বোঝানো যায়, যেমন যায়েদ উমরের দেখাদেখি কোন কাজ করল এবং ব্যর্থ হলো। এমতাবস্থায় জনপ্রবাদে বলা হয়—হংস চালে চলতে গিয়ে কাক তার আপন চাল ভুলে গেছে। তা হলে এ দৃষ্টান্তে কাক অর্থ যায়েদ আর হাঁস মানে ব্যক্তি উমর অবশ্যই নয়। বরং কাক দ্বারা প্রকৃত কাক এবং হাঁস দ্বারা এখানে আসল হাঁস বোঝানোই মূল উদ্দেশ্য। বস্তুত দু'টি ঘটনা একই প্রেক্ষাপটে, অভিন্ন অবস্থায় সংঘটিত হওয়াই এখানকার সার কথা। একটি ঘটনার প্রতি দর্শকের দৃষ্টি পড়াতে অপর ঘটনা স্মরণে এসে যাওয়ায় একটিকে অপরটির সাথে তুলনা করা হয়। এখানে যেরূপ যায়েদ আমর এবং এদের ঘটনাকে কাক ও হাঁসের সাথে তুলনা করা হয়েছে। অতএব সূফীগণের ভাষায় ঃ اذهب ايها الروح الخ (হে রূহ! তুমি গমন কর...) ব্যাখ্যার অর্থ হবে—হে পাঠক! কুরআন তিলাওয়াতকালে এখানে পৌছে এ ঘটনা থেকে তুমি শিক্ষা নিবে যে,

তোমার নিজের ভিতরেও ফিরআউন ও মূসা সদৃশ বিষয় রয়েছে। ঘটনাকে ঘটনা হিসেবে স্থুল দৃষ্টিতে পাঠ না করে বরং কুরআনে বর্ণিত প্রতিটি ঘটনা নিজের অবস্থার সাথে মিলিয়ে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর আর অগ্রসর হও। এই হলো আলোচ্য আয়াত থেকে সূফীগণের শিক্ষা ও মূল্যবোধ। এখন এর অস্বীকারকারী এবং কুরআনভিত্তিক জ্ঞানের দাবিদার উভয়পক্ষ ভ্রান্তিতে নিপতিত। বস্তুত এসব হলো তাবীল ও সূক্ষ্ম বাকনীতি পর্যায়ভুক্ত বিষয়, কুরআনকেন্দ্রিক মূল জ্ঞানের সংজ্ঞাভুক্ত নয়। বলা বাহুল্য, কুরআনী জ্ঞান তা-ই যার মাধ্যমে ইবারাতুন্ নস, ইশারাতুন নস, ইকতিযাউন্ নস অথবা দালালাতুন্ নস, ইত্যাদি দ্বারা প্রমাণ উপস্থিত করা শুদ্ধ হয়। অন্যথায় সেটা হবে লতীফা ও বাকমাধুর্য পর্যায়ের। —আল ইনফাক, পৃষ্ঠা ১০

৯৯. রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাবলীগ বর্জন করা জায়েয নহে।

এ পর্যায়ে সর্বাগ্রে আমাদের অবস্থা পর্যালোচনা করা উচিত যে, তাবলীগের প্রতি আমাদের আকর্ষণ আছে কি-না। লক্ষ করলে দেখা যাবে এ ব্যাপারে চিন্তা করার ক্ষেত্রেই আমরা শূন্যের ঘরে। আমরা একে আদিষ্ট হুকুমরূপে বিশ্বাস করি বটে কিন্তু তালাশ করলে বোঝা যায় তাবলীগ যে পর্যায়ের হুকুম আমরা একে তার চেয়ে অনেক নিম্নমানের ধারণা করি। তাবলীগ যে একটা ওয়াজিব হুকুম সে বিশ্বাস অতি নগণ্য লোকই পোষণ করে। কেউ মনে করে মুস্তাহাব, কেউ মুস্তাহ্‌সান বা উত্তম যা করা তো ভাল, না করায় গুনাহ নেই। গযবের কথা হলো—মুস্তাহ্‌সান যারাও বলে তাদের আবার শর্ত হলো যদি না রাজনৈতিক স্বার্থবিরোধী হয়, অন্যথায় 'ভাল-ও নয়। প্রথমত ওয়াজিবকে মুস্তাহাব জ্ঞান করাটাই ছিল গযবের কথা। দ্বিতীয় সর্বনাশ হলো—স্বার্থবিরোধী না হওয়ার শর্ত। এটা কেবল স্বার্থবাদী চিন্তার ফসল। দীনের কাজও আজকাল পার্থিব স্বার্থের দৃষ্টিতে বিচার করা হয়, দেখা হয় ব্যাপারটা স্বার্থের পরিপন্থী কি-না। অতঃপর কোথাও স্বার্থহানির উপক্রম হলে বলা হয়—এ পরিস্থিতিতে এটা স্বার্থহানিকর। কাজেই মুস্তাহাবও আর থাকল না। এখন একে আল্লাহ্‌র নির্দেশ বলে স্বীকারই করা হয় না। পরবর্তী পর্যায়ে কোন একদিন আদিষ্ট তাবলীগ নিষিদ্ধ বলে ফেললেও বিস্ময়ের কিছুই থাকবে না। দুঃখজনক ব্যাপার হলো—মুসলমানদের মধ্যে স্বার্থকে শরীয়তের অধীন জ্ঞান করার মানসিকতা আজ অনুপস্থিত। অথচ হওয়া উচিত ছিল এই যে, খোদায়ী হুকুম তো আগে বাস্তবায়িত হোক ব্যক্তি স্বার্থ পরে দেখা যাবে। কিন্তু আজকাল এমনটি করা তো হয় না, দুঃখ তো এখানে। কেউ কেউ বরং স্বার্থবশে ইসলামী দাওয়াতকে ফিতনা-ফাসাদ নামে আখ্যায়িত করতেও কসুর করে না। যে কারণে তারা এ ব্যাপারে শৈথিল্য ও অনীহার

ভাব প্রদর্শন করে চলে। এমনকি কাউকে তারা সঠিক নিয়মে নামায আদায় করছে না লক্ষ্য করা সত্ত্বেও এ কথা বলার সাহস পাচ্ছে না যে, নামায তোমার হয়নি সুতরাং আবার পড়। নফসের গোলামি আর প্রবৃত্তির দাসত্বই এর মূল কারণ। যে কারণে জানা সত্ত্বেও তারা মনগড়া ব্যাখ্যা রটনা করে নেয়। কিন্তু তাদের জানা উচিত যে, আল্লাহ্‌র নিকট ছলচাতুরী, মিথ্যা-বানোয়াট অচল। এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী প্রণিধানযোগ্য। বলা হয়েছে ঃ

بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ —

"বস্তুত মানুষ নিজের সম্পর্কে সম্যক অবগত। যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে।" ন্যায়ের দৃষ্টিতে লক্ষ করলে বোঝা যায় যে, পার্থিব জীবনকেই মানুষ কেবলা তথা মুখ্য উদ্দেশ্য করে নিয়েছে। মূলত সৎকাজে আদেশ না করার কারণ হলো—তা করা হলে পার্থিব স্বার্থ, বন্ধুত্ব, পারস্পরিক সখ্যতা বিনষ্ট হওয়ার এবং সচ্ছলতায় ভাটা পড়ার কাল্পনিক আশংকা। এরা মনে করে কারো ভুলে অঙ্গুলি নির্দেশের ফলে অসন্তুষ্ট হয়ে সে নির্যাতন চালাতে পারে, যাতে আমাকে বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। বস্তুত এসব বিপদাশংকা নেহায়েত কল্পনাপ্রসূত। সৎকাজে আদেশের দায়ে কল্পিত বিপদের অজুহাতে এ দায়িত্ব থেকে রেহাই পাওয়ার অবকাশ আছে কি না তা আলিমদের জিজ্ঞাসা করুন। তাদের থেকে জেনে নিন কোন্ ধরনের পরিস্থিতিতে হুকুম পালনের অনিবার্যতা থেকে মুক্তি দেয়। আমার কথা এটা নয় যে, মুক্তির কোন উপায় বা নিয়ম নেই। আছে অবশ্যই। কিন্তু নিজে মুফতী সেজে ফতোয়া না দিয়ে আলিমদের থেকে সে অক্ষমতার নিয়ম-কানুন জেনে নিন। সত্য কথা বলতে কি সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করতে কৃতসংকল্প ব্যক্তিই এ বিষয়ে প্রকৃত অনুসন্ধানকারী। অক্ষমতার নিয়ম-শর্ত জানার অধিকার তার স্বীকৃত। নিষ্ঠার সাথে জানতে চাইলে সবই তাকে বলে দেয়া যাবে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সে সব নিয়ম-শর্ত জানার, বোঝার কারো অধিকার স্বীকৃত নয়। কেননা যে ব্যক্তি কাজের ইচ্ছাই পোষণ করে না নিয়ম-শর্ত জিজ্ঞেস করার তার কি অধিকার ? কারণ তার প্রশ্ন হবে না করার উদ্দেশ্যে, জান বাঁচানোর নিয়তে। যখন কায়দা-কানুন জানা হয়ে যাবে, বলবে আমার এই অসুবিধা, সেই অজুহাত, ঐ শর্ত তো আমার মধ্যে অবর্তমান, কিরূপে আমি সৎকাজের আদেশের দায়িত্ব পালন করি ইত্যাদি। কাজেই কাজ আরম্ভ করার পূর্বে কাউকে অক্ষমতা ও শর্তাবলী ব্যক্ত করা আলিমগণের উচিতই নয়। যেমন কারো নামায পড়ার মোটে ইচ্ছাই নেই অথচ প্রশ্ন করে কোন্ পরিস্থিতিতে এ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। সে মাসআলা তাকে বলাই উচিত নয়। নতুবা সব সময় সে

তালাশ করবে আর চিন্তা করবে নামায থেকে কি করে যে বাঁচা যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি নামায পড়তে আন্তরিকভাবেই আগ্রহী আর অক্ষমের মাসআলা জানতে চায় নিঃসন্দেহে তাকে জানিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু যদি জানা যায় যে, কেবল জান বাঁচানোই তার উদ্দেশ্য তবে মুফতী সাহেবের উচিত তার জবাবই না দেয়া। আমার মতে বরং এমন লোককে ওযর-অসুবিধার সন্ধান জানানো জায়েয নয়।

—আদাবুত্তাবলীগ, পৃষ্ঠা ৪

১০০. হযরত মনসুর (র)-এর 'আনাল হক' বলার তাৎপর্য।

সে সময় 'আনাল হক' (আমি খোদা) উচ্চারণ হযরত মনসুরের নিজের কণ্ঠে ছিল না, বরং তখন তাঁর অবস্থা ছিল হযরত মূসা (আ)-এর বৃক্ষ থেকে انى انا الله رب العالمين (আমিই আল্লাহ্, জগতসমূহের পালনকর্তা) উত্থিত আওয়াজের ন্যায়। সে আওয়াজের উচ্চারণ দৃশ্যত যদিও ছিল বৃক্ষের অন্তরাল থেকে উদ্ভাসিত যা সংশ্লিষ্ট আয়াতের ভাষায় ঃ

نُوْدِىَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يَّا مُوْسٰى....)উপত্যকার দক্ষিণ পার্শে পবিত্র ভূমিস্থিত এক বৃক্ষ হতে তাকে আহবান করে বলা হলো—হে মূসা!........) তাহলে বৃক্ষ কি আপন কণ্ঠেই উচ্চারণ করে যাচ্ছিল..... انى انا الله (আমিই আল্লাহ্)....? আদৌ না। নতুবা গাছের 'রব' হওয়া অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। অপরপক্ষে এ-ও বলার অবকাশ নেই যে, সে আওয়াজ বৃক্ষের অন্তরাল থেকে উত্থিত কণ্ঠস্বর ছিলই না। অথচ তা ছিল অবিকল খোদায়ী আওয়াজ। কিন্তু মহান আল্লাহ্ আওয়াজ থেকে পবিত্র অথচ নির্দিষ্ট দিক ও স্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট কণ্ঠস্বরই হযরত মূসা (আ)-এর কানে ভেসে আসছিল, আল্লাহ্ একেই দক্ষিণ পার্শ্ব (وادى ايمن) পবিত্র ভূমি (بقعة مباركة) 'বৃক্ষ থেকে' (من الشجرة) ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত অবস্থায় বর্ণনা করেছেন। নতুবা অবিকল খোদায়ী কালাম হলে এতসব বিশেষণযুক্ত হওয়া আদৌ সঙ্গত ছিল না। অতএব স্বীকার করতেই হবে যে, সে আওয়াজ মূলত বৃক্ষ থেকেই উত্থিত হয়েছিল। কিন্তু এ স্বর গাছের নিজস্ব ছিল না, বৃক্ষের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে ছিল কেবল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ভাষ্যকারের ন্যায়। কুরআনে যেরূপ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ করে বলা হয়েছে ঃ فاذا قرناه فاتبع قرأنه "সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি তুমি কেবল সে পাঠের অনুসরণ করবে।" তাহলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন আওয়াজ অবশ্যই শুনতে পেতেন। অথচ আল্লাহ্ আওয়াজ থেকে পবিত্র, তাহলে قرأنا বাক্যের অর্থ কি ? তাই বলা হয়—এখানে জিবরাঈলের পাঠকেই আল্লাহ্‌র পাঠ নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেহেতু তাঁর পাঠ ছিল আল্লাহ্‌র হুকুমে অনুষ্ঠিত। এখানেও

তদ্রূপ বৃক্ষের কথাকে আল্লাহ্‌র ভাষণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ আল্লাহ্‌র হুকুমেই তার আওয়াজ। সুতরাং একইরূপে মনসুরের انا الحق উক্তি খোদায়ী ভাষণ আখ্যা দেয়া উচিত। কারণ আত্মহারা অবস্থায় আল্লাহ্‌র বাণীই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত, উচ্চারিত হয়েছিল, নিজের পক্ষ থেকে নয় বরং আল্লাহ্‌র আদেশেরই তিনি ছিলেন ভাষ্যকার মাত্র। সুতরাং জনৈক বুযুর্গের ঘটনায় এর সমর্থন লক্ষ করা যায়। তাহলো—এক বুযুর্গ ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে প্রশ্ন করেন—মনসুর নিজেকে খোদা বলেছে, তদ্রূপ ফিরআউনও। কিন্তু প্রথমজন আপনার মকবুল ও প্রিয় আর অপরজন অভিশপ্ত, হে আল্লাহ্! এর কারণ কি ? জবাবে বলা হলো—মনসুর আনাল হক বলেছিল আপন সত্তা এবং অস্তিত্ব বিলীন করার মাধ্যমে। পক্ষান্তরে ফিরআউন আমি খোদার খোদায়ী অস্বীকার করে উক্তি করেছিল انا ربكم الاعلى অর্থাৎ আমিই তোমাদের সেরা খোদা। অর্থ হলো—মনসুরের উক্তি নিজস্ব ছিল না, যেহেতু তিনি আপন ব্যক্তিসত্তা বিলীন করে ফেলেছিলেন। মাওলানা রূমী তাই বলেছেন ঃ

گفت فرعون انا الحق گشت پست

گفت منصورے انا الحق گشت مست

لعنت اللّٰہ آں انا را در قفا

رحمت اللّٰہ ایں انا را در وفا

—ফিরআউন 'আনাল হক' বলে ধ্বংসের সম্মুখীন হলো আর একই 'আনাল হক' মনসুর উচ্চারণ করে হয়ে গেলেন আত্মহারা! প্রথম 'আনার' পরিণাম হলো আল্লাহ্‌র লা'নত আর অভিশাপ। কিন্তু দ্বিতীয় 'আনার' প্রতিদানে রয়েছে মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি। —আল-মাওয়াদ্দাতুর রাহমানিয়া, পৃষ্ঠা ৩০

وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين –

ইফাবা—২০০০-২০০১-প্র/৩৯৫৫(উ)—৫২৫০